অন্ধকারের পটে আলোর তুলি দিয়া যে চিত্র অঙ্কিত হয় তাহা যেমন ভঙ্গুর তেমনি চঞ্চল। এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীও তেমনি নশ্বরতার দাবী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুধু ক্ষণিকের পুলকে, তুচ্ছতার কুহকে, ক্ষণিকের গান গাহিয়া যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হওয়াই ইহাদের ভূমিকা।

আলো যতদিন আছে ততদিন অন্ধকারও আছে। উভয়ে মিলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া যে ছায়াছবি রচনা করিয়া চলিয়াছে, এগুলি তাহারই অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

CHAYA PATHIK

by

Saradindu Banerjee

ছায়াপথিক

লেখকের অন্য বই—

কেন বাজাও কাঁকন
পথ বেঁধে দিল
রাজদ্রোহী
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন
তনুমন
কানু কহে রাই
দুর্গরহস্য
ঝিন্দের বন্দী
চুয়াচন্দন
কালের মন্দিরা

তৃতীয়পরিচ্ছেদ

মন্দাক্রান্তা

এক

তোড়জোড় করিয়া ছবি আরম্ভ করিতে বর্ষা নামিল।

বোম্বাই বর্ষা—একেবারে চাতুর্মাস্য। জৈষ্ঠ্য মাসের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন মেঘগুলা পশ্চিমের সমুদ্র হইতে আরব্য উপন্যাসের জিনের মতো উঠিয়া আসে এবং কয়েকদিন ঘোরাফেরা করিয়া বর্ষণের কিছু নমুনা দিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর দিন দশেক পরে তাহারা দলে দলে পালে পালে ফিরিয়া আসিয়া সেই যে আসর জমকাইয়া বসে তখন তিন মাসের মধ্যে আর সূর্যের মুখ দেখিবার উপায় থাকে না। দিনগুলোকে তখন রাত্রির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে হয় এবং জল ও স্থলের প্রভেদ এতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায় যে মানুষগুলোকে জলচর জীব বলিয়া মানিয়া লইতে আর কোনই কষ্ট হয় না।

কবি বলিয়াছেন—এমন দিনে তারে বলা যায়। কবির কথা মিথ্যা নয়, উপযুক্ত পাত্রপাত্রী পাইলে নিশ্চয় বলা যায়; একবার নয়, বারবার বলা যায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে ইনাইয়া বিনাইয়া বলা যায়; কিন্তু বলা ছাড়া আর কোনও উদ্যম-সাপেক্ষ কাজ করিবার ইচ্ছা বোধকরি কাহারও মনে উদয় হয় না। দেহ মনের এমন একটি আলস্যমন্থর জড়তা উপস্থিত হয় যে কবির শরণাপন্ন না হইয়াও বলিতে ইচ্ছা করে—সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।

এই তো গেল আটপৌরে ব্যবস্থা। তার উপর মাঝে মাঝে যখন সাইক্লোন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বর্ষার ঢিলা আসর এক মুহূর্তে

জমাট বাঁধিয়া যায়। তখন মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাতাস চৌদুনে ছুটিতে থাকে, দিগঙ্গনার নৃত্যে সভাতল আলোড়িত হইয়া ওঠে এবং আকাশের মৃদঙ্গ হইতে যে বোল্ উত্থিত হইতে থাকে তাহাকে কোনও মতেই ধামার বা দশকুশীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

কিন্তু ইহা যেমন আকস্মিক তেমনি ক্ষণিক। আবার ধীরে ধীরে সভা ঝিমাইয়া পড়ে; ঝিল্লীরব শোনা যায়; কেতকীর গন্ধবিমূঢ় বাতাস নেশায় ঝিম্ হইয়া থাকে।

এদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে; জড় জগতে অণু পরমাণুও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সুতরাং মানুষকেও কিছু-না-কিছু করিতে হয়; কিন্তু সব কাজই মন্দাক্রান্তা ছন্দে বাঁধা, গুরুগম্ভীর মন্থরতায় আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে চলিবার পর আবার শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়ে। পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল—

যাহোক, সোমনাথের কাজ একরকম ভালই চলিতেছিল। তাহার নূতন কাজে হাতেখড়ি, তাই সে আট ঘাট বাঁধিয়া কাজে নামিয়াছিল। পাণ্ডুরঙের সহিত সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া সে কাজ করিত, পাণ্ডুরঙ্ ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। তা ছাড়া ইন্দুবাবু প্রায়ই সেটে আসিয়া বসিতেন এবং কালোপযোগী উপদেশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। রুস্তমজিও কদাচিৎ আসিয়া বসিতেন এবং নীরবে তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। রুস্তমজির একটি মহৎ গুণ ছিল, একবার যাহার হাতে কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহার কার্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না।

সোমনাথ মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবার ছবির খরচ সে কিছুতেই দেড় লক্ষ টাকার উপরে উঠিতে দিবে না। রুস্তমজি অবশ্য আড়াই লক্ষ পর্যন্ত খরচ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, ছবি নির্মাণ ব্যাপারে অনেক অনাবশ্যক

খরচ হয়, অনেক টাকা—ন দেবায় ন ধর্মায়—যায়। এবার সে কিছুতেই তাহা ঘটিতে দিবে না। তাহার ছবি ভাল হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল; কিন্তু ভাল হইলেই চলিবে এমন কোনও কথা নাই। তাই খরচ যদি কম হয় তাহা হইলে লোকসানের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। লাভ যদি নাও হয়, অন্তত খরচটা উঠিয়া আসিতে পারে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে সদা শঙ্কিতচিত্তে সোমনাথ কাজ করিয়া চলিল। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে অতি সঙ্গোপনে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভগবান, আমি অতি অধম, কিন্তু যদি এতবড় সুযোগটা দিয়াছ, মাথায় পা দিয়া ডুবাইয়া দিও না।

এদিকে সোমনাথের পারিবারিক পরিস্থিতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জামাইবাবু হঠাৎ পুনায় বদ্‌লি হইলেন; ঘোর বর্ষার মধ্যে তিনি দিদিকে লইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু বাড়িখানা ছাড়া হইল না। কারণ জামাইবাবুর আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া সোমনাথের একটা আস্তানা চাই। সোমনাথ ভরা ভাদরে শূন্য মন্দিরে পড়িয়া রহিল।

মাঝে মাঝে পাণ্ডুরঙ্‌ আসিয়া তাহার বাসায় রাত্রিবাস করিয়া যাইত। দুইবন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছবির কথা আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তারপর সকালবেলা আবার একসঙ্গে কাজে বাহির হইত। রুস্তমজী সোমনাথকে একটি দ্বিতীয় পক্ষের মোটর কিনাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন হইলেও গাড়ীটি বেশ কর্মক্ষম, এই ভরা বর্ষার মরসুমে ভারি কাজে লাগিতেছিল।

এই সময় সোমনাথের আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছিল। এতদিন

তাহার জীবনে চিঠি লেখালেখির কোন পাট ছিল না; এখন চারিদিক হইতে তাহার কাছে চিঠি আসিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশ পত্রলেখকই অচেনা, কিন্তু দু'চারজন পরিচিত ব্যক্তিও আছেন। সোমনাথ বুঝিল তাহার প্রথম চিত্র সাধারণে প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে তাঁহার কীর্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরিচিত পত্র-লেখকগণ—তাঁহাদের মধ্যে তরুণীর সংখ্যা কম নয় —কেবল অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা আবার আর একটু দূরে গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় সোমনাথের পরিচিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, এতদিন তাঁহারা তাহার খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু এখন কোনও অলৌকিক উপায়ে তার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা পত্রাঘাত করিতে সুরু করিলেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা ছাপাইয়া একটি ইঙ্গিত কিন্তু খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল; সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সিনেমায় যোগ দিয়া অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করিতে প্রস্তুত আছেন। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তিনি সোমনাথের কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী, শীঘ্রই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। যৌবনকালে তিনি সখের থিয়েটার করিতেন; এই ওজুহাতে তিনি সোমনাথকে ধরিয়া পড়িয়াছেন, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সোমনাথ তাঁহাকে সিনেমায় টানিয়া লয়। ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা।

এই সব অপ্রত্যাশিত পত্রবৃষ্টির ফলে সোমনাথ প্রথমটা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে পাণ্ডুরঙের উপদেশ পাইয়া ধাতস্থ হইল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল—সিনেমায় সিদ্ধিলাভের ইহা একটি অনিবার্য

পরিণাম এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে হইলে পত্রগুলির উত্তর না দেওয়াই সমীচীন। চিঠি লেখার অভ্যাস সোমনাথের কোন-কালেই ছিল না, সে পরম আগ্রহের সহিত পাণ্ডুরঙের সারগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করিল।

কেবল একখানি চিঠি পড়িয়া সোমনাথ কিছু বিমনা হইল। কলিকাতা হইতে তাহার এক সমবয়স্ক বন্ধু লিখিয়াছে, বন্ধুটি আবার দূর সম্পর্কে জামাইবাবুর আত্মীয় হয়। বেচারা স্কুলের শিক্ষক, চিত্রাভিনেতা সাজিবার দুরভিসন্ধি তাহার নাই; নিতান্তই বন্ধুপ্রীতির বশবর্তী হইয়া চিঠি লিখিয়াছে। চিঠিখানি অংশতঃ এইরূপ—

'—ছবিটা চমৎকার হয়েছে; কলকাতার লোক হুমড়ি খেয়ে দেখছে। চন্দনা দেবীর ছবি অবশ্য জনপ্রিয় হয়, কিন্তু হিন্দী ছবি বাঙালীরা বেশী দেখে না। এবার বাঙালীরাও দেখছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, তুমি বাঙালী এবং তোমার অভিনয় সুন্দর হয়েছে। ছবিখানা বার তিনেক দেখেছি।

'একটা খবর দিই। যে তিন দিন আমি তোমার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম সেই তিনদিনই রত্নাকে সিনেমায় দেখলাম; সেও ছবি দেখতে গিয়েছিল। রত্না সিনেমা পছন্দ করে না জানতাম। ব্যাপার কি? শুনলাম কিছুদিন আগে সে বোম্বাই গিয়েছিল। এর ভেতরে কোনও নতুন তত্ত্ব আছে নাকি? যদি থাকে, ইতর জনের দাবী এখন থেকে জানিয়ে রাখছি—'

বন্ধুসুলভ চটুলতা বাদ দিয়া খবরটা দাঁড়ায়—রত্না তিনবার তাহার ছবি দেখিতে গিয়াছিল; তিন বারের বেশীও হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, কেন গিয়াছিল? খুব বেশী ভাল না লাগিলে একই ছবি কেহ তিনবার দেখে না। রত্না স্বভাবতই সিনেমার প্রতি বিরূপ; তার উপর সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে সে

সহসা সিনেমার অনুরাগিণী হইয়া পড়িবে এরূপ মনে করাও কঠিন। সোমনাথের প্রতি তাহার মন সদয় নয়। তবে, যে ছবিতে সোমনাথ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ছবি বারবার দেখিবার অর্থ কি? ছবিতে এমন কী অনিবার্য আকর্ষণ আছে যে রত্না না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সোমনাথ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পর-চিত্ত অন্ধকার; উপরন্তু রমণীর মন চিরদিনই গভীর রহস্যে আবৃত। সোমনাথ বিমর্ষচিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, রত্নার ছবি দেখার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তাহার কর্ম নয়।

দুই

কয়েকদিন ধরিয়া কোলাবা'র আবহ-মন্দির হইতে ভবিষ্যদ্‌বাণী হইতে ছিল—আরব সাগরের বায়ুমণ্ডলে সাম্য নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই একটা ঝড়ঝাপ্‌টা আশা করা যাইতে পারে। এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়মিত আবহ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং সংবাদপত্রে ছাপা হয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে এরূপ নজির না থাকায় কেহই উহা গ্রাহ্য করে না।

যাহোক, ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। আবহবার্তা তিন দিনের বাসি হইয়া যাইবার পর একদিন অপরাহ্ণের দিকে একটা এলোমেলো বাতাস উঠিল। বৃষ্টি সারাদিন ধরিয়াই পড়িতেছিল, এখন যেন আর একটু চাপিয়া আসিল। ক্রমে যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল ততই অলক্ষিতে বায়ুর বেগ বাড়িয়া চলিল।

সারাদিন ষ্টুডিওতে সোমনাথের শূটিং ছিল। সন্ধ্যা ছ'টার সময় কাজ শেষ করিয়া সে বাহির হইল। পাণ্ডুরঙকে বলিল—'চল, আজ রাত্রে আমার বাসায় থাকবে।'

পাণ্ডুরঙ বলিল—'উহুঁ। আকাশের গতিক ভাল নয়, রাত্রে সাইক্লোন দাঁড়াতে পারে। আমার বৌটা খাণ্ডার, আজ রাত্রে যদি বাড়ি না ফিরি কাল আর আমাকে আস্ত রাখবে না।'

সোমনাথ বলিল—'বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পাণ্ডুরঙকে বাসায় পৌঁছাইয়া সোমনাথ যখন নিজের বাসায় ফিরিল তখন দিনের আলো আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। বায়ুর বেগ আর একটু বাড়িয়াছে। রাস্তার গাড়ী ও মানুষের চলাচল অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেবল রাস্তার আলোকস্তম্ভগুলি অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া ধারাস্নান করিতেছে।

গ্যারাজে মোটর বন্ধ করিয়া সোমনাথ তাড়াতা[illegible] বাড়ির বারান্দায় আসিয়া উঠিল। বারান্দা অন্ধকার; জলের ছাট্ আসিয়া মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। সদর দরজার তালা বন্ধ ছিল; সোমনাথ পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

তালা খুলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল—'সোমনাথবাবু!'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার চক্ষু অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়াছিল; রাস্তা হইতে আলোর একটা ক্ষীণ আভাও আসিতেছিল। সোমনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, দ্বারের অনতিদূরে বারান্দার দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি স্ত্রীলোক স্যুটকেসের উপর বসিয়া আছে। তাহার পাশে বর্ষাতি হোলড্অলের মতো একটা কিছু পড়িয়া

রহিয়াছে।

সোমনাথ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'কে?'

স্ত্রী মূর্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি রত্না।'

মুহূর্তের জন্য সোমনাথের মাথাটা একেবারে খালি হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'রত্না!'

অন্ধকারে রত্নার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু তাহার কণ্ঠের তীক্ষ্ণ অধীরতা গোপন রহিল না—'হ্যাঁ। ব্যাপার কি? দাদা—বৌদি কোথায়?'

সোমনাথের মস্তিষ্ক আবার ইঞ্জিনের বেগে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। সে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটা সুইচ টিপিয়া ঘরের ও বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিল। তারপর আবার বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

রত্নার কাপড়-চোপড় বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টিতে শুষ্ক বিরক্তি। ক্ষিপ্র চক্ষে একবার সোমনাথের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া সে বলিল—'দাদা বৌদি কোথায়?'

সোমনাথ দুই হাতে রত্নার সুটকেস ও বিছানা তুলিয়া বলিল—'বলছি, আগে ভেতরে এস! একেবারে ভিজে গেছ যে। কতক্ষণ এসে বসে আছো?'

উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রত্না বলিল—'তিনটের সময় ট্রেন এসেছে; বাড়ি পৌঁছুতে চারটে বেজেছে। তারপর থেকেই বসে আছি।

'কি সর্বনাশ! তিন ঘণ্টা বাইরে বসে আছ?'—সোমনাথ লটবহর এক পাশে নামাইয়া রাখিল।

'হ্যাঁ; কিন্তু দাদা বৌদি কি বোম্বায়ে নেই?'

'জামাইবাবু আজ দশ দিন হল পুনায় বদলি হয়ে গেছেন। কেন, তোমরা খবর পাও নি?'

রত্না কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠা ভরা চোখে সোমনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—'না, আমি খবর পাই নি। আমি কলকাতায় ছিলাম না, এলাহাবাদে এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম। সেখান থেকে আসছি।—তা'লে এখন তুমি একা বাড়িতে আছো?'

সোমনাথ বলিল—'হ্যাঁ।'

নতমুখে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া রত্না মুখ তুলিল—'বাড়িতে চাকর-বাকরও কি নেই?'

সোমনাথ বলিল—'চাকর-বাকর? হ্যাঁ আছে বৈকি। একটা চাকর আর বামুন আছে। আমি সকাল বেলাই বেরিয়ে যাই, তারাও খেয়ে-দেয়ে দুপুর বেলা বেরোয়; কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসে। আজ কি জানি এখনও ফেরে নি। ওঃ—মনে পড়েছে—'

'কী?'

'আজ সকালে ওরা দু'জনে যোগেশ্বরীর গুহা দেখতে যাবে বলে ছুটি চেয়েছিল, সেখানে নাকি কোন্ সাধু এসেছেন। যোগেশ্বরী বেশী দূর নয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে হয়। হয় তো ঝড় বাদলে আটকে পড়েছে।'

'বেশ যা হোক। এখন আমি কি করি?' বলিয়া রত্না একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সোমনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'আপাতত ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলতে পারো।'

বিরক্তি-কণ্টকিত কণ্ঠে রত্না বলিল—'তা যেন পারি; কিন্তু আজ

রাত্রে আমি থাকব কোথায় ?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ রত্নার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল —'এ বাড়িতে থাকা কি চলবে না ?'

রত্না উত্তর দিল না, গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। এমন মুস্কিলে সে জীবনে পড়ে নাই।

সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলাই ছিল, হাওয়ার দাপটে কপাট দুটা বারবার আছাড় খাইতেছিল। সোমনাথ গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে রত্না মুখ তুলিল—'আজ রাত্রে পুনার ট্রেন পাওয়া যায় না ?—পুনা তো কাছেই।'

সোমনাথ ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিল, নীরস কণ্ঠে বলিল— 'পুনা এখান থেকে একশো কুড়ি মাইল। ট্রেন যদি বা পাওয়া যায়, পৌঁছুতে রাত দুপুর হবে। জামাইবাবুর ঠিকানা তোমায় দিতে পারি, কিন্তু এই ঝড়ের রাত্রে বাড়ি খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটাতে হবে। তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়—'

রত্না নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'কাল সকালেই যাব তা হলে। কি শুভক্ষণেই বোম্বাইয়ে পা দিয়েছিলাম।' বলিয়া নিজের সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া স্নানঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল।

সোমনাথ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর সেও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়িতে অতিথি, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আজ বারান্দায় রত্নাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য সোমনাথের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো তাহার মনের মধ্যে অহেতুক আনন্দের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাও ক্ষণকালের জন্য। রত্নার মুখের ভাবও

তাহার কথা বলার ভঙ্গী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে সোমনাথ রত্নার দাদার শ্যালক এবং রত্না সোমনাথের দিদির ননদ; ইহার অধিক সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে নাই। মাঝে একটা নূতন সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রত্না তাহা এতই রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া দিয়াছে যে তাহা স্মরণ করিতেও মন সঙ্কুচিত হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল লৌকিক সম্বন্ধটুকু বজায় রাখিয়া চলাই ভাল; রত্না খবর না দিয়া এবং খবর না লইয়া বোম্বাই উপস্থিত হইয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে তাহা যথাসম্ভব সহজ ও মামুলি করিয়া আনাই সোমনাথের কর্তব্য। অতীত প্রত্যাখ্যানের কাঁটা বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে করুক, বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না।

তিন

আধ ঘণ্টা পরে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া, রত্না স্নানঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল টেবিলের উপর এক পট্ চা এবং প্লেটের উপর রাশীকৃত পাঁউরুটি ও মাখন রহিয়াছে। রত্না একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—'এ কি, চাকর বামুন ফিরে এসেছে নাকি

সোমনাথ বলিল—'না; কিন্তু তাদের ভরসায় থাকলে আজ আর কিছু জুটবে না। তোমার নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নাও, আরম্ভ করে দাও।' বলিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

রত্নার মুখে একটু হাসি ফুটিল।

'তুমি আজকাল ঘরকন্নার কাজ খুব শিখেছ দেখছি!'

সোমনাথ চায়ের পেয়ালা তাহাকে দিয়া ঈষৎ গর্বের সহিত বলিল—

'ঘরকন্নার কাজ আমি অনেকদিন থেকে জানি। খেয়ে ছাখো চা ঠিক হয়েছে কিনা।'

রত্না পেয়ালার প্রান্তে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল—'মন্দ হয় নি।' তাহার স্বর নিরুৎসুক।

দু'জনেরই বিলক্ষণ পেট জ্বলিতেছিল, সেই দুপুর বেলার পর আর কিছু পেটে পড়ে নাই। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়ে চা ও মাখন পাঁউরুটিতে মনোনিবেশ করিল। ক্ষুন্নিবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে দু' একটা কথা হইতে লাগিল—

'কলকাতার খবর কি?'

'ভালই।'

'তুমি কোন্ কলেজে ভর্তি হলে?'

'ভর্তি হই নি। তোমার কেমন চলছে?'

'মন্দ নয়। চন্দনাদের কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি, শুনেছ বোধহয়।'

'না—শুনি নি। এখন কোথায় কাজ করছ?'

'এখন নিজে ছবি তৈরি করছি।'

'ও।'······

'আর চা নেবে? এখনও অনেকখানি আছে।'

'দাও।'

বাহিরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু ঘরের ভিতরটি শান্ত, কোনও চাঞ্চল্য নাই। দুইটি উদাসীন যুবক-যুবতী চা পান করিতেছে ও ছাড়া ছাড়া গল্প করিতেছে। তাহারা যেন এরোপ্লেনে চড়িয়া চলিয়াছে, বাহিরের প্রচণ্ড গতিবেগ ভিতরে অনুভব করা যায় না। যাত্রীদের মনে হয় তাহারা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

'লেখাপড়া কি ছেড়ে দিলে?'

'না। এবার কলেজে যায়গা পেলাম না।'

'ও। তোমাকে এবার একটু রোগা দেখাচ্ছে।'

'তা হবে। তোমার স্বাস্থ্য তো ভালই দেখছি।'

'হ্যাঁ। খাটলে খুটলে শরীর বেশ ভাল থাকে।'

'সত্যি। তার ওপর যদি মনের মতো কাজ হয়।'

সোমনাথ একটু ফিকা হাসিল। কাজ মনের মতো কিনা এ কথা লইয়া সতর্ক করিয়া লাভ নাই।

চায়ের পর্ব শেষ হইলে রত্না বলিল—'এখনকার মতো তো হল; কিন্তু রাত্তিরের কি ব্যবস্থা হবে?'

সোমনাথ বলিল—'সে তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হবে কি করে? বামুনের তো দেখা নেই।'

'তা হোক, হয়ে যাবে।'

রত্না ভ্রূ তুলিল—'তুমি রাঁধবে নাকি?'

'আমি কি রাঁধতে জানি না? খুব ভাল রাঁধতে জানি। খেয়ে দেখলে বুঝবে।'

'দরকার নেই আমার। বোম্বাই এসে অবধি অনেক দুর্গতি হয়েছে, তার ওপর তোমার রান্না সহ্য হবে না।' বলিয়া রত্না ভাঁড়ার ঘর তদারক করিতে গেল।

সোমনাথ ক্ষুণ্ণভাবে সিগারেট ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে রত্না ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'খিচুড়ি আর ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুধু চাল আর ডিম আছে।'

সোমনাথ বলিল—'আমার ভাঁড়ারের দৈন্য দেখে লজ্জা পেলাম। অবশ্য খিচুড়ি আর ডিম ভাজা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমারই কষ্ট হবে।'

রত্না বলিল—'তা হোক। আমি কিছু মনে করব না।'

'সে তোমার মহত্ত্ব ; কিন্তু রান্নাটা আমি করলেই ভাল হত। ভেবে ছাখো তুমি আমার অমিথি। তুমি রাঁধবে আর আমি খাব —এ যে বড় লজ্জার কথা'

'আমি কাউকে বলব না।'

সোমনাথ বসিয়া রহিল ; রত্না আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া কোমরে জড়াইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

উনান ধরানোর কোনও হাঙ্গামা ছিল না, রান্নাঘরে গ্যাসের উনান। রত্না ক্ষিপ্রহস্তে যোগাড়যন্ত্র করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

রাত্রি দশটার সময় বসিবার ঘরের একটা সোফায় যথাসম্ভব লম্বা হইয়া শুইয়া সোমনাথ মুদিত চক্ষে ঝড়ের শব্দ শুনিতেছিল। বাহিরে বাতাসের মত্ততা বাড়িয়াই চলিয়াছে ; মাঝে মাঝে তাহার উন্মত্ত পাক্‌সাটে বাড়িখানা মড় মড় করিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম দিক হইতে একটা গভীর একটানা গর্জন বাড়ির বন্ধ দরজা জানালা ভেদ করিয়া কানে লাগিতেছে।

রত্না আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

'বাঃ বেশ মানুষ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সোমনাথ উঠিয়া বসিল।

'ঘুমোই নি। চোখ বুজে ঝড়ের মনের কথাটা শোনবার চেষ্টা করছিলাম।'

রত্নার চোখে বিদ্রূপ খেলিয়া গেল—'তাই নাকি? তা কী শুনলে?'

এলোমেলো কথা, ভাল বুঝতে পারলাম না।'

'তাহলে এবার খাবে চল। খাবার তৈরি।'

দু'জনে গিয়া খাইতে বসিল। তপ্ত খিচুড়ির ঘ্রাণ নাকে যাইতেই সোমনাথের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৃপ্তির ভাব

গোপন করিয়া বিচারকের ভঙ্গীতে চামচের আগায় একটু খিচুড়ি তুলিয়া মুখে দিল।

রত্না জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন হয়েছে খিচুড়ি?'

সোমনাথের এবার জবাব দিবার পালা, তাহার অধরে একটি চকিত হাসি খেলিয়া গেল। সে আর এক চামচ খিচুড়ি মুখে দিয়া গম্ভীর-ভাবে বিবেচনাপূর্বক বলিল—'মন্দ হয় নি।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, তারপর হাসিয়া ফেলিল। তাহারই মুখের কথা এতক্ষণ পরে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিল। সোমনাথ ভাবিতে লাগিল—রত্না এত ভাল রাঁধিতে শিখিল কেমন করিয়া? আজকালকার মেয়েরা তো লেখাপড়া লইয়া থাকে কিম্বা সিনেমা দেখে; রান্নাঘরের খোঁজ রাখে না। রত্না কোন্ ফাঁকে এমন রাঁধিতে শিখিল? অথবা মেয়েদের হাতে কোনও সহজাত ইন্দ্রজাল আছে, তাহারা স্পর্শ করিলেই অন্ন-ব্যঞ্জন সুস্বাদু হইয়া ওঠে? অথবা সোমনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বামুন ঠাকুরের রান্না গলাধঃকরণ করিতেছে তাই আজ রত্নার নিরেস রান্নাও তাহার সরস মনে হইতেছে? কিম্বা—

'ঝড় আর কতক্ষণ চলবে?'

'ঠিক বলতে পারি না। শুনেছি পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশী থাকে না।'

'ও'টা কিসের শব্দ হচ্ছে—ঐ যে গোঁ গোঁ শব্দ?'

'ওটা সমুদ্রের গর্জ্জন।'

'ও—' রত্না সোমনাথের পানে একটা তির্যক কটাক্ষপাত করিল—'তা—সমুদ্রের মনের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছ নাকি?'

'পাচ্ছি।'

'সত্যি? কি শুনলে?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'রাগ আর ভালবাসা —ভালবাসা আর রাগ।'

ক্ষণেকের জন্য দু'জনের চোখে চোখে বিদ্যুৎ বিনিময় হইয়া গেল, তারপর দু'জনেই চক্ষু সরাইয়া লইল।

আহারান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া সোমনাথ বলিল—'তোমার শোবার ঘরে বিছানা পেতে দিয়েছি।'

রত্না চোখ মেলিয়া সোমনাথের মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ভ্রূকুটি করিল।

'তোমার বিছানা পাতবার দরকার ছিল না। আমি নিজেই পেতে নিতে পারতাম।'

সোমনাথ বলিল—'তা পারতে জানি; কিন্তু আমারও তো কিছু করা চাই। যাহোক, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। একে ট্রেনের ক্লান্তি, তার ওপরে রান্নার পরিশ্রম।'

রত্না আর কোনও কথা না বলিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খাটের উপর বিছানা পাতা, বিছানার পদপ্রান্তে একটি গায়ের চাদর সযত্নে পাট করা। রত্নার হোল্‌ড্‌অলে একজোড়া বেড্‌ রুম স্লিপার ছিল, সে দুটি খাটের নীচে রাখা রহিয়াছে।

রত্না কিয়ৎকাল শয্যার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর উষ্ণ-অধীর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে সমুদ্রের রাগমিশ্রিত ভালবাসার দুরন্ত আফ্‌সানি কিছুতেই শান্ত হইতেছে না—বাড়িখানা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

ক্লান্ত হইয়া অবশেষে রত্না আলো নিভাইয়া শুইতে গেল; কিন্তু ঘর বড় অন্ধকার, অন্ধকারে বাহিরের শব্দগুলো যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। রত্না ফিরিয়া আসিয়া আবার আলো জ্বালিল, তারপর আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া

পড়িল।

সোমনাথও নিজের ঘরে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বিছানাটি ভারি ঠাণ্ডা, একটা গায়ের কাপড় হইলে ভাল হইত; কিন্তু নিজের গায়ের কাপড়টি সে রত্নাকে দান করিয়াছে। যাহোক যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, বিছানার চাদর টানিয়া গায়ে দিলেই চলিবে।

রত্না না মনে করে—সোমনাথের কাছে সে অনাদৃতা হইয়াছে। সোমনাথ কোন অবস্থাতেই রত্নাকে অনাদর করিতে পারিবে না; কিন্তু রত্না আসিয়া পর্যন্ত বারবার তাহাকে আঘাত করিতেছে কেন? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল—এক সন্ধ্যার বর-বধূ অভিনয়—তাহার জন্য তো সোমনাথ দায়ী নয়। আর বর্তমানে জামাইবাবু পুনরায় বদলি হইয়াছেন, ইহার জন্যই বা তাহাকে কি প্রকারে দোষী করা যাইতে পারে? কিন্তু সে যা-ই হোক রত্না যে এই রাত্রে ইষ্টিশানে গিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে যে এই শূন্য বাড়িতে তাহার সহিত একাকী কাটাইতে সম্মত হইয়াছে ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে।

আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের সুখের রাত্রি, না দুঃখের রাত্রি? ঝড়ের ঝাপ্‌টায় বাসা-ভাঙা পাখী যেমন অন্ধভাবে উড়িয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় লয়, রত্না তেমনি তাহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে; আবার কাল সকালে ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে উড়িয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু তবু, সুখের হোক আর দুঃখের হোক আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের চিরদিন মনে থাকিবে। রত্না যখন পরের ঘরণী হইয়া বহু দূরে চলিয়া যাইবে, আর তাহাকে বিরক্ত-ভাবেও স্মরণ করিবে না, তখনও আজিকার রাত্রিটি সোমনাথের মনে জাগিয়া থাকিবে।

চার

রাত্রি তখন একটা কি দেড়টা।

সোমনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সোমনাথ অনুভব করিল, চারিদিকে ভীষণ খট্‌খট ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইতেছে; যেন একদল ডাকাত যুগপৎ বাড়ির দরজা জানালাগুলোকে আক্রমণ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঘুমের মধ্যে এই শব্দগুলো সে অনেক্ষণ ধরিয়া শুনিতেছিল, সুতরাং তাহার ঘুম ভাঙার কারণ এই শব্দগুলো নয়। সোমনাথ কান পাতিয়া শুনিল, ঝড়ের শব্দের সহিত মিশিয়া আর একটা শব্দ হইতেছে—কেহ তাহার দরজায় ধাক্কা দিতেছে; ইহা ঝড়ের ধাক্কা নয়, মানুষের হাতের ধাক্কা!

এক লাফে বিছানা হইতে নামিয়া অন্ধকারেই সে দরজা খুলিয়া দিল।

'রত্না ?'

জলে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিবার পর মাথা জাগাইয়া মানুষ যেমন হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানে তেমনি ভাবে হাঁপাইয়া রত্না বলিল—'হ্যাঁ। আলো নিভে গেছে।'

'আলো নিভে গেছে ?'

দ্বারের পাশেই আলোর সুইচ। সোমনাথ হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না। সে বলিল—'ইলেক্‌ট্রিক তার ছিঁড়ে গেছে।'

রত্নার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কী হবে? বাড়ি কি ভেঙে পড়বে ?'

'না না তুমি ভয় পেয়ো না। সাইক্লোনে বাড়ির ভাঙতে পারে না। রাস্তায় কোথাও গাছের ডাল ভেঙে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে দিয়েছে, তাই আলো নিভে গেছে।'

রত্না বলিল—'তুমি কোথায়? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া দু'জনে কিছুক্ষণ হাতড়াইল; তারপর হাতে হাত ঠেকিল। সোমনাথ হাত ধরিয়া রত্নাকে ঘরের ভিতরে আনিল। রত্না কতকটা যেন নিজ মনেই ভাঙা গলায় বলিল—'আলো জেলে ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ চারিদিকে মড়্‌মড়্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল—দেখি আলো নিভে গেছে—'

সোমনাথ অনুভব করিল রত্নার হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, অল্প অল্প কাঁপিতেছে। সে সাহস দিয়া বলিল—'হঠাৎ অন্ধকারে ঘুম ভেঙেছে বলে ভয় পেয়েছ, নৈলে ভয়ের কিছু নেই। এবার আস্তে আস্তে ঝড়ের বেগ কমবে।'

'যদি বাড়ে?'

'আর বাড়তে পারে না।—তুমি দাঁড়াও, আমি দেশলাই আনি। আমার জামার পকেটেই আছে।'

অনিচ্ছা ভরে রত্না হাত ছাড়িয়া দিল। সোমনাথ শয়নের পূর্বে গায়ের জামা খুলিয়া আল্‌নায় টাঙাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ঠাহর করিয়া গিয়া জামাটা পাইয়া পরিয়া ফেলিল। তারপর পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমনি রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। দেশলায়ের আলোতে রত্নাকে দেখিয়া সোমনাথের বুকের ভিতরটা চমকিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই; গায়ে বিস্রস্ত বসনের উপর চাদরটা কোনও মতে জড়ানো। এ রত্না যেন তাহার পরিচিত আত্মপ্রতিষ্ঠ অচপল রত্না নয়; প্রকৃতির

ভয়ঙ্কর প্রলয় মূর্তির সম্মুখে একান্ত অসহায় এক মানবী। প্রকৃতির বিরাট শক্তি দেখিয়া মানুষ কেবল অভিভূতই হয় না, নিজের অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রতাও অনুভব করে। তখন তাহার সঙ্কুচিত সত্তার অঙ্গ হইতে দর্পের আভরণও খসিয়া পড়িয়া যায়।

সোমনাথের ইচ্ছা হইল রত্নাকে ভীত শিশুর মতো বুকে জড়াইয়া সান্ত্বনা দান করে; কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিয়া সে একটু আশ্বাস-জনক হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল।

'অন্য সময় মনে হয় না যে দেশলায়ের কাঠিতে এত আলো হয়। কাঠি কিন্তু বেশী নেই—'

'অ্যাঁ! কি হবে তাহলে?' বলিতে বলিতে কাঠি নিভিয়া গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বালিয়া সোমনাথ বলিল—'তুমি এখানে এসে বোসো—বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

'মোমবাতি নেই?'

'যতদূর জানি নেই। তবে মনে হচ্ছে একটা টর্চ আছে। তুমি যদি একটু একলা থাকো, আমি খুঁজে দেখতে পারি; বোধহয় দিদির ঘরে আছে।'

শঙ্কা-বিলম্বিতকণ্ঠে রত্না বলিল—'আচ্ছা, বেশী দেরী কোরো না।'

কয়েক মিনিট রত্না অন্ধকারে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর সোমনাথের ফিরিয়া আসার পদশব্দ শুনিতে পাইল।

'পেলে?'

উত্তরে সোমনাথ দপ্‌ করিয়া রত্নার মুখের উপর টর্চ জ্বালিয়া ধরিল। টর্চের আলো খুব উজ্জ্বল, প্রায় সাধারণ বিদ্যুৎ-বাতির সমান। সোমনাথ হাসিয়া বলিল—'এই নাও আলো। আর ভয় করছে না তো?'

রত্না আলোর দিক হইতে চোখ সরাইয়া লইয়া এবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল। টর্চের ছটার বাহিরেও ঘরটি আলোকিত হইয়াছে। রত্নার অধরোষ্ঠ একবার কাঁপিয়া উঠিল, সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'না, ভয় আর করছে না—তবে—'

'তবে?' বলিয়া জ্বলন্ত টর্চটি শয্যার ওপর রাখিয়া সোমনাথ এক-পাশে বসিল।

রত্না একবার তাহার পানে তাকাইল, তারপর হঠাৎ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্ত্রীজাতির স্নায়বিক বিপর্যয় সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না; কিন্তু সে বুঝিল, ইহা ভয়ের কান্না নয়, ভয়-ত্রাণের কান্না। হয়তো সেই সঙ্গে নিবিড়তর কোনও মনস্তত্ত্ব মিশিয়াছিল, হয়তো লজ্জা বা পশ্চাত্তাপের আগুনে হৃদয়ের অবরুদ্ধ বাষ্প উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা নির্ণয় করিবার মতো বিশ্লেষণী শক্তি সোমনাথের ছিল না। তাহার হৃদয় স্নেহে ও করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। সে রত্নার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল—'রত্না—কেঁদোনা লক্ষ্মীটি—রত্না—'

রত্নার কান্না কিন্তু থামিল না।

মিনিট পনেরো পরে রত্নার ফোঁপানি যখন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখন সোমনাথ হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল 'রত্না' এস এক কাজ করা যাক।'

রত্না চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। চোখের জলে ভিজিয়া মুখখা আরও নরম হইয়াছে; সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—'কী?'

সোমনাথ বলিল—'এস চা তৈরি করে খাওয়া যাক। ভারি মজা হবে কিন্তু। খাবে?'

রত্না ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সোমনাথ খাট হইতে নামিয়

বলিল—'আচ্ছা, তুমি তাহলে বোসো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা তৈরি করে আনছি।'

রত্নাও খাট হইতে নামিল।

'না, আমি চা তৈরি করব।'

'বেশ, দু'জনেই তৈরি করিগে চল। একলা ঘরে বসে থাকার চেয়ে সে বরং ভাল হবে।'

দু'জনে রান্নাঘরে গিয়া টর্চের আলোতে চা তৈয়ার করিল, তারপর চায়ের বাটি হাতে আবার খাটে আসিয়া বসিল।

সোমনাথ এক চুমুক চা খাইয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—'বাঃ, কি সুন্দর চা হয়েছে। তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না মৃদুস্বরে বলিল—খুব ভাল লাগছে।'

প্রতি চুমুকের সঙ্গে চায়ের আতপ্ত মাধুর্য তাদের স্নায়ু শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

সোমনাথ ভারি উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিল। সে উঠিয়া টর্চটাকে খাটের ছত্রিতে ঝুলাইয়া দিল, টর্চের আলো শূন্য হইতে চন্দ্র কিরণের মতো শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িল।

রত্নার মুখখানি শান্ত। সে সহজকণ্ঠে বলিল—'তুমি চায়ের সঙ্গে সিগারেট খাও না?'

'খাই—চায়ের সঙ্গে সিগারেট জমে ভাল।'

'তবে খাচ্চ না কেন?'

'খাবো?'

'খাও।'

সোমনাথের মনও মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল। সে সিগারেট ধরাইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে রত্না খাটের শিয়রের দিকে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। সোমনাথ বলিল—'রত্না, শুনতে পাচ্ছ, ঝড়ের

শব্দ ক্রমে কমে আসছে?'

রত্না বলিল—'হুঁ।'

'এদিকে ছুটো বেজে গেছে। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে।'

রত্না চোখ বুজিয়া বলিল—হুঁ।'

'যাই বল, আজকের রাত্তিরটা মনে রাখবার মতো। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল।—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

মুদিতচক্ষে রত্না বলিল—'না, তুমি কথা বল আমি শুনি।'

সোমনাথ এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলিতেছিল, এখন আবার আত্ম-সচেতন হইয়া পড়িল। কথা বলিতে হইবে মনে হইলেই আর কথা যোগায় না। রত্নার শুনিতে ভাল লাগে এমন কী কথা সে বলিবে?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিবে? ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা? কিম্বা—শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে? কিন্তু না, রত্নাকে কবিতা শোনানো বর্তমান ক্ষেত্রে উচিত হইবে না, রত্না এরূপ আচরণের কদর্থ করিতে পারে। তবে এখন সে কি কথা বলিবে?

একটা কথা বলা যাইতে পারে, রত্না নিশ্চয় কিছু মনে করিবে না। সোমনাথ মনে মনে একটু ভণিতা করিয়া লইয়া বলিল—'আমার প্রথম ছবিটা বাজারে বেরিয়েছে—বেশ নাম হয়েছে।'

রত্না নীরব রহিল। সোমনাথ তখন সাহস করিয়া বলিল—'কলকাতাতেও ছবিটা চলছে। তুমি—তুমি দেখেছ নাকি?'

রত্না সাড়া দিল না। সোমনাথ উত্তরের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রাত্নার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল, রত্নার চক্ষু-পল্লব স্থির, শান্ত ভাবে নিশ্বাস পড়িতেছে। রত্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিল। ক্লান্ত হইয়া রত্না ঘুমাইয়াছে, তাহাকে জাগানো উচিত হইবে না; কিন্তু এ-ঘরে সোমনাথের থাকা কি ঠিক হইবে? বরং সে গিয়া রত্নার বিছানায় শুইয়া কোনও মতে রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে।

কিন্তু দ্বার পর্যন্ত গিয়া সোমনাথ আবার ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া রত্না যদি দেখে সোমনাথ নাই, সে হয়তো ভয় পাইবে—ঝড় কমিয়াছে বটে, কিন্তু থামে নাই—

সোমনাথ আবার সন্তর্পণে খাটের একপ্রান্তে উঠিয়া বসিল। রত্না নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে; তাহার একটি হাত গালের নিচে চাপা রহিয়াছে। সোমনাথ একবার সেই দিকে তাকাইল; তারপর বাহু দিয়া দুই হাঁটু জড়াইয়া লইয়া ঊর্ধে আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি ভাবে বসিয়াই সে বাকি রাতটা কাটাইয়া দিবে। টর্চের ব্যাটারি দীর্ঘকাল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। তাহারও চক্ষু যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে।

পরদিন বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙিয়া সোমনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, রত্না কখন্ উঠিয়া গিয়াছে।

বাহিরে ঝড় স্তব্ধ হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে না, আকাশ থমথম করিতেছে।

মুখ হাত ধুইয়া সোমনাথ যখন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রত্না বাহিরে যাবার সাজ পোষাক পরিয়া বসিয়া আছে। সে সোমনাথের মুখের পানে না তাকাইয়া বলিল—'আমি এখনি পুনা যাব।'

সোমনাথ নীরবে চাহিয়া রহিল। এ সেই পুরানো পরিচিত রত্না,

কাল রাত্রে হঠাৎ যে-রত্নাকে দেখিয়াছিল সে-রত্না নয়। মুখের ডৌল দৃঢ় এবং নিঃসংশয়, কোথাও এতটুকু দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নাই। এই রত্নাই কি তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল? কাল রাত্রে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল তাহা কি সত্য, না স্বপ্নের মরীচিকা-বিভ্রম?

রত্না বলিল—'টাইম টেব্‌ল দেখেছি, সাড়ে আটটার সময় একটা ট্রেন আছে—'

সোমনাথ লক্ষ্য করিল, রত্না তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছে না; বোধহয় চোখে চোখ মিলাইতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু লজ্জা করিবার কিছু আছে কি?

রত্না আবার বলিল—'আর দেরী করলে ট্রেন পাব না। একটা গাড়ী কি ট্যাক্সি—'.

সোমনাথ চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল—'চল, আমি তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

মোটরে যাইতে যাইতে কেবল একবার কথা হইল; রত্না জিজ্ঞাসা করিল—'এ মোটর কার?'

সোমনাথ কেবল বলিল—'আমার।'

ট্রেন ছাড়িবার আধ মিনিট আগে রত্না গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সোমনাথের জামার বুক-পকেটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—'তোমার আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ।' বলিয়া ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কাল গভীর রাত্রে সোমনাথের অন্তর-গহনে যে ভীরু ফুলটি সঙ্গোপনে ফুটিয়াছিল তাহা এতক্ষণে সম্পূর্ণ শুকাইয়া টুপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ট্রেন চলিয়া গেল। আকাশে যে মেঘগুলো এতক্ষণ স্তম্ভিত

হইয়াছিল, তাহারা আবার ধীরে ধীরে বর্ষণ সুরু করিল।
সোমনাথ ফিরিয়া গিয়া মোটরে ষ্টার্ট দিল ; তারপর ক্লান্ত দেহমন লইয়া ষ্টুডিওর দিকে চলিল। আজও সারাদিন শূটিং আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভুজঙ্গ-প্রয়াত

এক

দীপালী উৎসবের কিছুদিন পূর্বে সোমনাথের ছবি শেষ হইল। এই অপরান্ত প্রদেশে দীপালীই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব ও নূতন খাতা। এই সময় শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় নূতন করিয়া ছুরি শানাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

চলচ্চিত্রও ব্যবসা। ছবি তৈয়ার হইলে তাহাকে সম্প্রদান করার পালা। কন্যা বয়স্থা হইলে যেমন পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হয়, ছবি তৈয়ার হইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। চিত্র-জনকেরা তখন ঘটকের দ্বারস্থ হন। চিত্র সমাজে এই ঘটকের অখণ্ড প্রতাপ। ভবানীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী যেমন শিবই বোঝেন, গিরিরাজ বোঝেন না, তেমনি ছবি যাহারা প্রস্তুত করে অতি পরিচয়ের ফলে ছবির সৌন্দর্য বুঝিবার ক্ষমতা আর তাহাদের থাকে না। এইসূত্রে ছবির পরিবেশকেরা আসিয়া আসর জুড়িয়া বসেন। ইঁহারা ছবির জহুরী এবং দালাল। অর্থব্যয় করিয়া ছবি তৈয়ার করা ইঁহাদের কাজ নয়, আবার ছবিঘর প্রস্তুত করিয়া ছবি প্রদর্শন করাও ইঁহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। ইঁহারা কেবল একজনের প্রস্তুত ছবি অন্য একজনকে সাধারণে প্রদর্শন করিবার অধিকার দিয়া দালালিটুকু আত্মসাৎ করেন। ধনিকতন্ত্রের আমলে অধিক পরিশ্রম না করিয়া এবং সর্বপ্রকার লোকসানের ঝুঁকি বাদ দিয়া অর্থ উপার্জনের যতগুলি পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ছবির ডিস্ট্রিবিউশন তাহাদের মধ্যে একটি।

সোমনাথের ছবি দেড় লাখ টাকার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ্ ও রুস্তমজি ছাড়া আর কেহ জানিত না। ছবির কাট-ছাঁট শেষ হইলে একদা রাত্রিকালে রুস্তমজি, সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ্ ও ইন্দুবাবু নিভৃতে ছবিখানি আগা-গোড়া দেখিলেন। দেখিয়া কিন্তু ছবির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য করিতে পারিলেন না। সোমনাথ গালে হাত দিয়া বসিল। ছবি যদি জনসাধারণের মুখরোচক না হয়? রুস্তমজির অন্য ছবিগুলি যে পথে গিয়াছে এটিও যদি সেই পথে যায়? যে আশা-ভরসা ও উদ্যম লইয়া সে ছবি আরম্ভ করিয়াছিল এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই। যে গল্প তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল তাহাই এখন একেবারে আলুনি ও নিরামিষ মনে হইতেছে।

পাণ্ডুরঙ্ ও ইন্দুবাবুর অবস্থা তাহারই মতো। কেবল রুস্তমজি ভরসা দিলেন—'তুমি ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করছি।

পরদিন সন্ধ্যার পর রুস্তমজি তাঁহাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সকলেই চিত্র-পরিবেশক। সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ্ ও ইন্দুবাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আহারের আয়োজন রাজকীয়; সঙ্গে তরল দ্রব্যেরও ব্যবস্থা আছে। সকলে লম্বা টেবিলে আহারে বসিলেন; নানাবিধ রঙ্গ পরিহাসের মধ্যে আহার চলিল। সকলেই জানিতেন এই নিমন্ত্রণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু কেহই সে কথার উল্লেখ করিলেন না।

পানাহার শেষ হইলে রুস্তমজি সকলকে আহ্বান করিয়া ষ্টুডিওর প্রোজেক্শান হলে লইয়া গেলেন। ছোট একটি প্রেক্ষা-গৃহ; ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছবি কেমন হইতেছে তাহা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ষ্টুডিওতেই এইরূপ একটি প্রেক্ষা-গৃহ থাকে।

লম্বাটে ধরণের একটি ঘর; তাহার একপ্রান্তে একটি পর্দা, অপর প্রান্তে কয়েকটি চেয়ার সাজানো। মাথার উপর টিম্ টিম্ করিয়া একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। সকলে উপবিষ্ট হইতেই আলো নিভিয়া গেল, ছবি দেখানো আরম্ভ হইল।

দুইঘণ্টা পরে ছবি শেষ হইলে সকলে আবার অফিস ঘরে আসিয়া সমবেত হইলেন। কেবল পাণ্ডুরঙ্ রুস্তমজির অনুমতি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

রুস্তমজি এবার অতিথিদের স্পষ্ট প্রশ্ন করিলেন—'ছবি কেমন লাগল আপনাদের?'

সকলেই পরস্পরের পানে আড়চোখে চাহিয়া মুখ কাঁচুমাচু করিলেন; তাঁদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সোমনাথের বুক দমিয়া গেল। ইঁহারা অবশ্য ব্যবসাদার লোক; কোনও ছবিকে মন খুলিয়া ভাল বলেন না, পাছে ছবির দর বাড়িয়া যায়; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁদের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সত্যই তাঁহারা ছবি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন।

বাঞ্ছুভাই নামক একজন প্রবীণ পরিবেশক জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছবি কে ডিরেক্ট করেছে রুসিভাই?'

সোমনাথকে দেখাইয়া রুস্তমজি বলিলেন—'ইনি করেছেন।'

বাঞ্ছুভাই তখন সোমনাথকে একটু আড়ালে লইয়া স্নিগ্ধ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। লোকটি ঘোর অশিক্ষিত, কিন্তু মিষ্টভাষী সোমনাথকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে প্রথম চেষ্টা হিসাবে ছবিটি মন্দ না হইলেও পাবলিকের চিত্তাকর্ষক ছবি তৈয়ার করা একদিনের কাজ নয়; অনেক অভিজ্ঞতার দরকার। ছবি কি ভাবে চিত্তাকর্ষক করিতে হয়, কি কি মালমশলা ভাল ছবির পক্ষে অপরিহার্য তাহা তিনি নানা উদাহরণ সহকারে সোমনাথের

হৃদয়ঙ্গম করাইতে লাগিলেন। নিরুপায় সোমনাথ বিদ্রোহভরা অন্তর লইয়া নীরবে শুনিয়া চলিল।

সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, ইন্দুবাবুকেও দুই তিন জন পরিবেশক ঘিরিয়া ধরিয়াছেন; ইন্দুবাবু প্যাঁচার মতো মুখ করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছেন। শেষে আর বোধকরি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি রুস্তমজির নিকট বিদায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। গল্প রচনার সময় তাহাতে দুই একটি রিভলভার ও একটি নারীহরণ না থাকিলে যে সিনেমার গল্প একেবারেই অচল, একথা তিনি বেশীক্ষণ গলাধঃকরণ কবিতে পারিলেন না।

ওদিকে রুস্তমজিকে যাঁহারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার প্রতি করুণামিশ্রিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে ক্রটি করিতেছিলেন না এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে ছবি তৈয়ার করিতে কত খরচ হইয়াছে। শেষে একজন অনেকটা স্পষ্ট করিয়াই প্রশ্ন করিলেন—'ছবিতে নামজাদা আর্টিষ্ট কেউ নেই, নাচ-গানও না থাকার সামিল; খরচ নিশ্চয়ই খুব কম হয়েছে।'

রুস্তমজি অম্লান বদনে বলিলেন—'ছবিতে আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়েছে।'

সকলেই ঠোঁট উল্টাইলেন—'বড় বেশী খরচ হয়েছে—নতুন লোকের হাতে কাজ দিলে ঐ হয়! অতটাকা ছবি থেকে উঠবে না রুসিভাই। আজ আমরা তাহলে উঠি।'

রুস্তমজি বলিলেন—'আমার আড়াই লাখ খরচ হয়েছে। আমি বেশী লাভ চাই না; তিন লাখ পেলেই আমি ছবি ছেড়ে দেব।'

আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না—'সাহেবজি' বলিয়া রুস্তমজিকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইলেন।

অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সোমনাথ সে-রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

দুই

পরদিন সকালবেলা সোমনাথ চা পান করিতে বসিয়াছে এমন সময় পাণ্ডুরঙ্‌ আসিল।

সে উপবেশন করিলে সোমনাথ তাহার দিকে টোষ্টের প্লেট আগাইয়া দিয়া বলিল—'কি খবর? কাল অত তাড়াতাড়ি চলে গেলে যে?'

পাণ্ডুরঙ্‌ উত্তর দিল না, একটা খালি পেয়ালায় চা ঢালিয়া লইল; তারপর এক টুকরা টোষ্টে কামড় দিয়া আপন মনে চিবাইতে লাগিল। পাণ্ডুরঙের ভাবভঙ্গী সোমনাথের অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছিল, সে বুঝিল পাণ্ডুরঙের পেটে কোনও কথা আছে। উৎসুক ভাবে চাহিয়া সে বলিল—'কি, কথাটা কি?'

পাণ্ডুরঙ্‌ টোষ্ট গলাধঃকরণ করিয়া এক চুমুক চা খাইল, তারপর বলিল—'ছবি ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ উচ্চকিত হইয়া উঠিল—'অ্যাঁ, কে বললে?'

পাণ্ডুরঙ্‌ একটু হাসিয়া বলিল—আমার বৌ বল্‌ল।'

'তোমার বৌ? সে কি! তিনি জানলেন কি করে?'

'কাল রাত্রে বৌকে এনে প্রজেকশান হলে লুকিয়ে রেখেছিলাম; তোমরা দেখতে পাও নি। সে ছবি দেখেছে।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'বৌ কখনও কোনও ছবির প্রশংসা করে না! কিন্তু যে-ছবি তার ভাল লাগে সে-ছবির মার নেই।'

'এ ছবি তাঁর ভাল লেগেছে?'

'শুধু ভাল লেগেছে! সারা রাত্রি আমাকে ঘুমোতে দেয় নি কেবলই ছবির কথা বলেছে।'

সোমনাথ মনে মনে খুবই আনন্দিত হইল, কিন্তু তবু তাহার সংশয় ঘুচিল না। সে বলিল—'তুমি আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বাড়িয়ে বলছ না তো?'

পাণ্ডুরঙ্ সিগারেট ধরাইয়া বলিল—'বিশ্বাস না হয় তুমি নিজেই তাকে প্রশ্ন করে দেখবে চল।'

সোমনাথ সোৎসাহে উঠিয়া বলিল—'তাই চল। তাঁর মুখে শুনলে তবু ভরসা হবে। হাজার হোক তিনি নিরপেক্ষ দর্শক; কিন্তু ফন্দিটা তুমি খুব বার করেছিলে তো!'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'মনটা ভারি উতলা হয়েছিল ভাই। ছবি কেমন হয়েছে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। অথচ বাইরের লোককেও দেখানো যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত বৌকে পাকড়াও করেছিলাম। অবশ্য মনে ভয় ছিল, ও যদি খারাপ বলে তাহলে আর রক্ষে নেই। তাই আগে থাকতে তোমাদের কিছু বলি নি।'

সোমনাথ হাসিয়া বলিল—'তিনি যদি খারাপ বলতেন তাহলে তুমি কি করতে?'

পাণ্ডুরঙ সরল ভাবে বলিল—'চেপে যেতাম।'

দুই বন্ধু মোটর চড়িয়া বাহির হইল। পাণ্ডুরঙের বাসায় সোমনাথ পূর্বে কয়েকবার গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীকেও দেখিয়াছিল, দোহারা মজবুত গোছের স্ত্রীলোক, মুখশ্রী গোলগালের উপর মন্দ নয়; বয়স ত্রিশের নীচেই। কাছা দিয়া শাড়ী-পরা স্বল্পভাষিণী এই মারাঠী মহিলাকে সোমনাথের খুব রাশ ভারি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

দু'জনে যখন পৌঁছিল তখন দুর্গাবাঈ ঝাঁটা হস্তে ঘর ঝাঁট দিতেছিলেন। অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে ঝাঁটা সরাইয়া রাখিয়া তিনি হাসিমুখে সোমনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন; নিজেই বলিলেন—

'আপনার ছবি কাল দেখে এসেছি। খুব ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ বলিল—'পাণ্ডুরঙের মুখে সেই কথা শুনে ছুটে এলাম। সত্যি ভাল হয়েছে ?'

'সত্যি ভাল হয়েছে। এমন কি—' পাণ্ডুরঙের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দুর্গাবাঈ বলিলেন—'উনিও এবার ভদ্রলোকের মতো অভিনয় করেছেন।'

সোমনাথ হাসিয়া উঠিল—'দেখলে, পাণ্ডুরঙ্। ভদ্রলোকের সঙ্গ-গুণে তুমিও ভদ্রলোক হয়ে উঠেছ।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আমি যে স্বভাবতই ভদ্রলোক, অনুকূল অবস্থায় সেটা ফুটে উঠেছে মাত্র।'

সোমনাথ বলিল—'যাহোক, আমাদের হিরোইনকে আপনার কেমন লাগল ?'

দুর্গাবাঈ বলিলেন—'সুন্দরী নয়, তবে বয়স কম। আর, ভারি মিষ্টি অভিনয় করেছে।'

'আর আমি ?'

'আপনি তো সকলের কান কেটে নিয়েছেন।' বলিয়া স্বামীর প্রতি একটি স্মিত অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্গাবাঈ চা তৈয়ার করিতে গেলেন।

পাঁপর ভাজা সহযোগে দ্বিতীয় প্রস্থ চা পান করিতে করিতে সোমনাথ আবার প্রশ্ন করিল—'আচ্ছা, ছবির মধ্যে কোন্ জিনিষটা আপনার সব চেয়ে ভাল মনে হ'ল ?'

দুর্গাবাঈ নিঃসংশয়ে বলিলেন—'গল্প।'

'এ গল্প সকলের ভাল লাগবে ?'

'লাগবে। আমি সাধারণ মানুষ, আমার যখন ভাল লেগেছে তখন সকলের ভাল লাগবে।'

'আপনাকে যদি আবার ছবি দেখতে অনুরোধ করি আপনি খুশী হয়ে দেখতে যাবেন ?'

'যাব। আবার কবে দেখাবেন বলুন।'

সোমনাথ টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিল—'ব্যস্, তাহলে আর ভাবনা নেই।'

পাণ্ডুরঙের বাসা হইতে ষ্টুডিও যাইতে যাইতে কিন্তু সোমনাথের মন আবার সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। একটি স্ত্রীলোকের ভাল লাগার উপর কি নির্ভর করা চলে! সকলের রুচি সমান নয়—

ষ্টুডিও পৌঁছিয়া দু'জনে রুস্তমজির কাছে গিয়া বসিল। পাণ্ডুরঙ বলিল—'হুজুর, একটা বেয়াদপি করে ফেলেছি, মাফ করতে হবে।' বলিয়া স্ত্রীকে ছবি দেখানোর কথা বলিল।

রুস্তমজি ধূর্ত চক্ষে হাসি ভরিয়া বলিলেন—'তাতে কোনও দোষ হয় নি। তোমার বিবির ভাল লেগেছে তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রুস্তমজি বলিলেন—'আমারও মনে হচ্ছে ছবিটা ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—'কি করে জানলেন ? ওরা কিছু বলেছে নাকি ?'

রুস্তমজি নিজের বুকে টোকা মারিয়া বলিলেন—'আমার মন বলছে ছবি ভাল হয়েছে। ওরা বরং উল্টো কথাই বলছে। আজ বাঞ্ছুভাই ফোন করেছিল।'

'কি বললেন তিনি ?'

'ছবির অনেক খুঁত কেড়ে শেষে বলল—'অল্ ইণ্ডিয়া রাইট্সের জন্যে দেড় লাখ টাকা দিতে পারে।'

'মিনিমান্ গ্যারাণ্টি ?'

'না, একেবারে সরাসরি বিক্রী। কি বল তোমরা ? ছেড়ে দেব ?'

সোমনাথ ভাবিতে লাগিল, দেড় লাখ টাকায় ছবি ছাড়লে কিছুই লাভ থাকে না। কিন্তু লোকসানও হয় না। লোকসান না হওয়াটা কম কথা নয়।

সোমনাথ প্রশ্ন করিল—'আর অন্য ডিস্ট্রিবিউটাররা কোনও অফার দেন নি?'

রুস্তমজি বলিলেন—'উহুঁ। তাদের সাড়াশব্দ নেই। ওদের মধ্যে বাঙ্কুভাই তবু সমঝদার; সে বুঝেছে ছবি নতুন ধরণের হলেও তার জিনিষ আছে। তার লোভ হয়েছে। চাপ দিলে দু'লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে।'

সোমনাথ বলিল—'দু'লাখ যদি পাওয়া যায় তাহলে বোধহয় ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

রুস্তমজি পাণ্ডুরঙের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন—'তুমি কি বল?'

পাণ্ডুরঙ্ দ্বিধাভরে বলিল—'লাখ বেলাখের কথা আমি বুঝি না হুজুর। আপনি কি বলেন?'

রুস্তমজি বলিলেন—'ছবি যদি ভাল হয়ে থাকে, তাহলে ভয় পেয়ে সস্তায় ছেড়ে দেওয়া বোকামি; ব্যবসাদার হয়ে আমি ওদের কাছে ঠকে যেতে রাজি নই।'

'তাহলে কি করবেন?'

'আমি দর কমাব না। দেখি যদি ওরা রাজি হয়। যদি না হয় তখন 'অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'অন্য ব্যবস্থা কী করবেন?'

রুস্তমজি উত্তর দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

তিন লাখ টাকা দিতে কিন্তু কেহই রাজি হইল না। বাঞ্ছুভাই এক লাখ ষাট হাজার পর্যন্ত উঠিলেন; অন্য সকলে স্পষ্টই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

সোমনাথের মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ছবির যথার্থ মূল্য জানিবার কি কোনও উপায় নাই? অন্ধের মতো পরের নির্ধারিত মূল্যে নিজের জিনিষ পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে? এত পরিশ্রম করিয়া শুধু দিনমজুরিটুকু লইয়া ঘরে ফিরিতে হইবে? আর কতগুলা দালাল তাহার কৃতিত্বের সুফল ভোগ করিবে? ইহাই কি ব্যবসায়ের দুর্লঙ্ঘ্য রীতি?

বাণিজ্য নীতির সহিত সোমনাথের নূতন পরিচয় ঘটিতেছিল। বাণিজ্য লক্ষ্মী যে ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে আঁকা-বাঁকা পথে চলেন, তাঁহার মাথা হইতে মণি হরণ করিতে হইলে যে শুধু দুর্দম সাহস নয়, অপরিসীম চাতুরীরও প্রয়োজন, এ অভিজ্ঞতা তাহার নাই।

রুস্তমজি একদিন সোমনাথকে বলিলেন—'তুমি বড় ঘাবড়ে গেছ দেখছি; অত ঘাবড়ালে ব্যবসা চলে না। ব্যবসায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। চল, আজ বাঞ্ছুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বাঞ্ছুভাই নিজের অফিসে পরম সমাদরের সহিত তাদের অভ্যর্থনা করিলেন; রুস্তমজিকে পান ও সোমনাথকে সিগারেট খাইতে দিলেন কিন্তু তাঁহার কথার নড়চড় হইল না। সবিনয়ে বলিলেন—'রুসিভাই, এ ছবির জন্যে আর বেশী দিলে আমার ছেলেপুলে খেতে পাবে না। তোমার খাতিরে দশ হাজার বেশী দিচ্ছি, আর পারব না।'

রুস্তমজি বলিলেন—'বেশ, ঐ টাকাই মিনিমাম্ গ্যারান্টি দাও।'

বাঞ্ছুভাই জিভ কাটিয়া বলিলেন—'মিনিমাম্ গ্যারান্টিতে ছবি নেওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি রুসিভাই। সবাই সন্দেহ করে, সবাই বলে আমি চুরি করি। কাজ কি ওসব ঝামেলা' বলিয়া মুখে বৈষ্ণবভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রুস্তমজি উঠিয়া পড়িলেন—'বেশ, এখন দিচ্ছ না। এর পরে কিন্তু এত সস্তায় পাবে না।

ষ্টুডিওতে ফিরিয়া আসিয়া রুস্তমজি বলিলেন—'সোমনাথ আজ তুমি বাড়ি যাও। আমি একটু ভেবে দেখি। কাল এর হেস্তনেস্ত করব।'

পরদিন সোমনাথ রুস্তমজির কাছে গিয়া বসিতেই তিনি বলিলেন—'ঠিক করে ফেলেছি। ছবি কাউকে দেব না, আমি নিজেই হাউস ভাড়া নিয়ে ছবি দেখাব।'

সোমনাথ কিয়ৎকাল হতবাক্ হইয়া রহিল, তারপর বলিল—'কিন্তু, তাতে আরও অনেক খরচ—'

'পাবলিসিটিতে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করব; তাছাড়া হাউসের ভাড়া আছে সবশুদ্ধ বড় জোর পঞ্চাশ হাজার। যদি লেগে যায়—'

'যদি না লাগে?'

রুস্তমজি সোমনাথের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তুমি ইয়ং ম্যান হয়ে ভয় পাচ্ছ? এতটুকু সাহস নেই?'

সোমনাথ বলিল—'নিজে জন্যর ভয় পাচ্ছি না, রুসিবাবা; কিন্তু আপনার এই শেষ সম্বল, এ নিয়ে জুয়া খেলা উচিত নয়। বরং লাভ যদি নাও হয়—'

রুস্তমজি বলিলেন—'আমি জুয়াড়ী, সারা জীবন জুয়া খেলেছি। তোমাকে যখন ছবি তৈরী করতে দিয়েছিলাম তখনও জুয়া খেলেছিলাম। আজও জুয়া খেলব; লাগে তাক না লাগে তুক।

বাঙ্কুভাই আজ আমাকে দমক দিচ্চে ; যদি পাশার দান পড়ে—ছবি উৎরে যায়—তখন আমি বাঙ্কুভাইকে দমক দেব। এই তো জীবন।'

ইহার পর আর কিছু বলা যায় না। বৃদ্ধ জুয়াড়ী যখন সর্বস্ব পণ করিয়া জুয়ায় মাতিয়াছে তখন তাহাকে ঠেকানো অসম্ভব। সোমনাথ নিজের রক্তের মধ্যেও জুয়ার উত্তেজনা অনুভব করিল।

'বেশ, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

রুস্তমজি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেওয়ালী কবে ?'

সোমনাথ বলিল—'আর দিন দশেক আছে।'

'যথেষ্ট। দেওয়ালীর দিন আমার ছবি রিলীজ করব।'

দেওয়ালীর দিন ছবি মুক্তিলাভ করিল।

প্রথম সপ্তাহে আয় হইল চৌদ্দ হাজার ; দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাব্বিশ হাজার।

যে সকল পরিবেশক পূর্বে গা ঢাকা দিয়াছিলেন তাঁহারা পাগলের মতো রুস্তমজিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু রুস্তমজির এখন পায়া ভারি ; তিনি কাহারও সহিত দেখা করিলেন না।

পাণ্ডুরঙ্‌কে ডাকিয়া রুস্তমজি একটি বিশ ভরির সোনার হার তাহার হাতে দিলেন—'এইটি তোমার বিবি ক দিও। তাঁর কথা শুনেই আমি এতবড় জুয়ায় নেমেছিলাম।' তারপর সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'তোমাকে আর কী দেব ? আমার যা কিছু সব তোমাকে দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বাঙ্কুভাই অবশেষে একদিন রুস্তমজিকে ধরিয়া ফেলিলেন। রুস্তমজি অফিস ঘরে বসিয়া ছিলেন, বাঙ্কুভাই এক রকম জোর করিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

দুই বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন ; শেষে বাঞ্চুভাই বলিলেন 'রুসিভাই, তোমারই জিৎ। ছবির জন্যে কত টাকা চাও ?'

রুস্তমজির মুখে বিজয় গর্বিত হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না ; এই মুহূর্তের বিজয়ানন্দ যেন পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বাঞ্চুভাই আবার বলিলেন—'তুমি বলেছিলে তিন লাখ টাকায় ছবি বিক্রি করবে। আমি তিন লাখ দিতে রাজি আছি।

রুস্তমজি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন।

'এখন আর তিন লাখে হবে না।'

'কত চাও ?'

'পাঁচ লাখ।'

বাঞ্চুভাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

'তার কমে হবে না ?'

'না।'

'আমাকে একটু ভাববার সময় দেবে ?'

রুস্তমজি বলিলেন—'ভাববার সময় নিতে পারো ; কিন্তু ইতিমধ্যে কেউ যদি বেশী দিতে রাজি হয়, তখন আর পাঁচ লাখে পাবে না।'

বাঞ্চুভাই আর দ্বিধা না করিয়া পকেট হইতে চেক্‌বুক বাহির করিলেন।……

হিসাব করিয়া সোমনাথের ভাগে লাভের অংশ এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা পড়িল। রুস্তমজি চেক লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং দুই হাতে তাহার করমর্দন করিলেন।

'যাও, কিছুদিন কোথাও বেড়িয়ে এস। তারপর নতুন ছবি আরম্ভ করবে।'

অফিস হইতে বাহিরে আসিয়া সোমনাথ চেকটি খুলিয়া দেখিল। এক লাখ ত্রিশ হাজার! সে এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকার মালিক!

হঠাৎ তাহার মনটা কেমন যেন বিকল হইয়া গেল। টাকা রোজগার করা এত সহজ! শুধু একটু চাতুরী, আর একটু হটকারিতা—ইহার বেশী প্রয়োজন নাই? অথচ এই টাকার জন্য কোটি কোটি মানুষ মাথা কুটিয়া মরিতেছে!

তারপরই তাহার মনে প্রতিক্রিয়া আসিল। আর তাহার অন্ন-চিন্তা নাই। সে স্বাধীন—স্বাধীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্খলিত-লতা

এক

ইন্দুবাবুর সঙ্গে সোমনাথের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাহাকে নিজের বাসায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইন্দুবাবুর স্ত্রী রন্ধনে সুনিপুণা, তাঁহার হাতের চিংড়ি-মাছের মালাই-কারি ও কাঁকড়ার ঝাল খাইয়া সোমনাথ পরম তৃপ্তিলাভ করিত।

আহারের পর ইন্দুবাবু গড়গড়ার মাথায় খাম্বিরা তামাকুর তাবা চড়াইয়া নল হাতে লইয়া বসিতেন; তখন তাঁহার মুখ দিয়া নানা প্রকার মজার গল্প বাহির হইত। নিম্নোক্ত কাহিনীটি তিনি একদিন সোমনাথকে শুনাইয়াছিলেন। কাহিনীর মধ্যে কোনও প্রচ্ছন্ন হিতউপদেশ ছিল কিনা তাহা বলা যায় না; সম্ভবত অভিজ্ঞতার বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা গল্পটি ইন্দুবাবুর জবানিতে প্রকাশ করিলাম।—

ছয় বছর আগে এ গল্পের আরম্ভ হয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় থাকি। সাহিত্য-চর্চার ফাঁকে ফাঁকে গান গাইতাম। গলাটা তখন ভাল ছিল; রবিবাবুর গান গাইতে পারতাম।

সাহিত্যিক হিসেবে যত না হোক, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অবৈতনিক গায়ক রূপে কলকাতার অভিজাত সমাজে আমার বেশ মেলামেশা ছিল; কোথাও পার্টি বা জলসা হলেই আমার নেমন্তন্ন থাকত। সেই সূত্রেই দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টারের মেয়ে লতার সঙ্গে পরিচয় হয়। লতা কিছুদিন আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখবার জন্যে খুব ঝুঁকেছিল;

আমিও শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। লতার প্রাণে দুরন্ত আবেগ ছিল—কিন্তু তার গলার সুর ছিল না—

একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখি, এটা লতা ও ললিতের গল্প; আমি দর্শক মাত্র। লতাকে তুমি চিন্‌বে না; বড়লোকের মেয়ে এবং কলকাতার বিশিষ্ট অতি-আধুনিক সমাজের মুকুটমণি হলেও সাধারণের কাছে সে অপরিচিতা; কিন্তু ললিতের নাম নিশ্চয় শুনেছ; পর্দায় তাহার চেহারাও দেখেছ বোধহয়—বাংলা চিত্রাকাশের উজ্জ্বল পুং তারকা।

আগে লতার কথাই বলি। এমন আশ্চর্য মেয়ে আমি দেখি নি। তখন তার বয়স সতেরো কি আঠারো; একটু পুরন্ত গড়ন—দেখলে মনে হয় রজনীগন্ধার বোঁটায় একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে; কিন্তু কী তার মনের তেজ, যেন আগুনের ফুল্‌কি। আর তেম্‌নি কি সরলতা! মনের কথা লুকোতে জান্‌ত না; মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন কথা বলে বসতো যে শ্রোতাদের কান লাল হয়ে উঠতো, তার বাবা লজ্জিত হয়ে পড়তেন; কিন্তু লতার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লাগত; ঠিক যেন শেক্সপীয়ারের মিরাণ্ডার সঙ্গে ক্লিওপেট্রা মিশেছে। সরলতা আর তেজ। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এ মেয়ের জীবনের ধারা শেষ পর্যন্ত কোন্ বিচিত্র খাতে বইবে কে জানে! সাধারণ গতানুগতিক খাতে যে বইবে না তা অনেকটা অনুমান করেছিলাম।

তাকে দু'চার দিন গান শেখাতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, গান গাওয়া তার কর্ম নয়। গলায় সুর নেই; ভগবান মেরেছেন; কিন্তু কথাটা তাকে বলতে সঙ্কোচ হতে লাগল; হয়তো মনে কষ্ট পাবে।

একদিন সে নিজেই বলল—'মাষ্টারমশাই, আমার গলায় সুর নেই—না? আমি গাইতে শিখব না?'

আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, বললাম,—'তোমার গলা বেশ মিষ্টি—কিন্তু—তুমি বাজনা বাজাতে শেখো না কেন? সেতার কিম্বা এস্রাজ—'

লতার চোখ জলে ভরে উঠল—'বাজনা বাজাতে আমার ভাল লাগে না। এত দুঃখু হচ্চে যে আমি গান গাইতে পারব না।'

বললাম—'আমারও দুখ হচ্চে লতা!'

লতা চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করল—'যাক গে, উপায় নেই যখন, তখন আর কেঁদে কি হবে। আপনি কি আসা বন্ধ করতে পারবেন না। অন্তত হপ্তায় একদিন আসতে হবে। গাইতে না পারি আপনার গান শুনতে তো পাব। বলুন আসবেন।'

খুশী হয়েই কথা দিলাম। না যাবার কোনও কারণ ছিল না; লতা ভারি যত্ন ক'রে খাওয়াতো। তাছাড়া ব্যারিষ্টার সায়েবও খুব খাতির করতেন। ভদ্রলোক কম বয়সে বিলেত থেকে ফিরে কিছু মাতামাতি করেছিলেন,—শোর-গরু খেয়েছিলেন; তারপর পঞ্চাশোর্ধ্বে আবার ঠাণ্ডা হয়ে জপতপ সন্ধ্যা অহ্নিক আরম্ভ করেছেন।

যাহোক, তারপর মাঝে মাঝে যাতায়াত করি। ক্রমে লতা গান-শিখতে না পারার শোক ভুলে গেল; তবে আমি গেলে প্রত্যেক বারই দু' একটা গান না শুনে ছাড়ত না। সে সময় আমি বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় প'ড়ে মাঝে-মধ্যে সিনেমার গান প্লে-ব্যাক করতাম। বাংলা দেশের পুরুষ অভিনেতাদের যে গানের গলা নেই একথা অনেকেই জানে না, দর্শকেরা মনে করে অভিনেতাই বুঝি গান গাইছে। সিনেমার এইসব অজানা নতুন গান শুনতে

লতা ভারি ভালবাসত।

একদিন তাকে একটা নতুন গান শুনিয়ে আমি বললাম—'শীগগির এই গানটা সিনেমায় শুনতে পাবে, একটি নতুন ছেলের মুখে।'

লতা জিগ্যেস করল,—'নতুন ছেলেটি কে?'

বললাম—'তার নাম ললিত, এই প্রথম ছবিতে হিরোর পার্ট পেয়েছে। ভারি ভাল ছেলে, আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে চিনি। তার বড় ইচ্ছে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে মেলামেশা করে।'

লতা বলল—'তবে তাঁকে নিয়ে আসেন না কেন?'

আমি বললাম—'সে সিনেমার অভিনেতা—তাকে তোমরা ভদ্রসমাজে মেশবার অযোগ্য মনে করতে পার, তাই সাহস ক'রে আনি নি।'

লতা বললে—'কিন্তু তিনি যদি ভদ্রলোক হন তাহলে অযোগ্য মনে করব কেন?'

বললাম—'তুমি না করলেও তোমার বাবা মনে করতে পারেন। বাজারে সিনেমার লোকের সুনাম নেই।'

লতার বাবা ঘরেই ছিলেন, আমি তাঁর পানে তাকালাম; কিন্তু তিনি হাঁ না কিছুই বললেন না। তাঁর নির্বিকার মুখ দেখেও বুঝতে পারলাম না তাঁর মনের ভাবটা কি। কারণ, লতা যাই বলুক, গৃহস্বামীর অমতে একজন আগন্তুককে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি না।

কিন্তু লতার চোখ একটু খর হয়ে উঠল। সে বলল—'সিনেমার লোক সবাই মন্দ হয়? তবে যে বললেন ইনি ভদ্রলোক।'

আমি বললাম—'ললিত যে ভদ্রলোক আমি তার জামিন হ'তে পারি।'

লতা বলল—'তবে কেন বাবা আপত্তি করবেন? উনি আপত্তি করলেও আমি শুনব না।'

লতার বাবা একটু হাসলেন, বললেন—'শুনলেন তো আধুনিকা মেয়ের কথা!' তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সহজ স্বরে বললেন—'আপনি তাকে নিয়ে আসবেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ললিতকে ভাল ছেলে বলেছিলাম, এ কথার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি ছিল না। আমার গাঁয়ের ছেলে, আমি তাকে একরত্তি বেলা থেকে দেখেছি—যেমন শান্তশিষ্ট তেমনি বুদ্ধিমান। তার বাপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, তাই বাড়ির শিক্ষা-দীক্ষা ভালই হয়েছিল। আজকাল বেশীর ভাগ ছেলেরই মনে আদর্শ-বিভ্রাট ঘটেছে দেখা যায়। বিলিতি কালচার আর দেশী সংস্কৃতির ভেজালে এক কিম্ভূতকিমাকার চরিত্র তৈরি হয়; তারা হাত তুলে নমস্কার করবার বিদ্যেটাও ভুলে গেছে, আবার শেকহ্যাণ্ড করবার কায়দাটাও আয়ত্ত করতে পারে নি। ললিতের চরিত্রে কিন্তু দেশি বিলিতি সংস্কারের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হয়েছিল। তার মনটা যেমন ছিল খাঁটি দেশী, তেমনি আচার-ব্যবহার দেখে তাকে সেকেলে ব'লে মনে হত না, বরং একটু বেশী মাত্রায় আধুনিক ব'লে মনে হত। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের, একাল ও সেকালের সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল তার মনে।

ললিত কলকাতায় বি-এ পড়ছিল, হঠাৎ তার বাবা মারা গেলেন। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, ললিতকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল। চাকরির সন্ধানে আমার কাছে এল। তখন আমিই চেষ্টা চরিত্র ক'রে তাকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিলাম। তার চেহারা ভাল; একেবারে নব-কার্তিক না হলেও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে এমন

একটি মিষ্টি কমনীয়তা ছিল যে দেখলেই ভাল লাগে। তাকে সিনেমায় ঢোকাতে বেশী বেগ পেতে হয় নি, যদিও সে গান গাইতে জানত না।

প্রথম বছরখানেক শিক্ষানবিশীতে কেটে গেল, দু'একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করল। তারপর সে হিরোর পার্ট পেল।

এই সময় আমাদের গল্পের আরম্ভ। ললিত তখন ওয়েলেসলি অঞ্চলে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে। ভারি ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট; ললিতের সৌখীন স্বভাবের ছাপ তার প্রত্যেকটি টুকিটাকিতে পরিস্ফুট। একলা মানুষ, তাই মাইনে তখন খুব বেশী না পেলেও বেশ ষ্টাইলে থাকতো।

কিন্তু তার মনে একটা দুঃখ ছিল, সিনেমার লোকের সঙ্গে সে প্রাণ খুলে মেলামেশা করতে পারত না। কাজের সময় সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করত, কিন্তু একটু ছুটি পেলেই আমার কাছে পালিয়ে আসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমার সঙ্গে গল্প করত, গিন্নীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। ক্রমে আমি তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। জল বিনে মীন—তার শিক্ষা এবং রুচি যে পরিবেশ কামনা করে, সে-পরিবেশ তার কর্মক্ষেত্রে নেই! তাই তার প্রাণটি হাঁপিয়ে উঠেছে; তাই আমার কাছে ছুটে ছুটে আসে।

কিন্তু আমাকেও কাজকর্ম করতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প করলে আমারই বা চলে কি ক'রে? বুদ্ধিটা প্রথমে আমারই মাথায় এসেছিল, ললিত মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু বলে নি। আমি ভাবলাম, লতাদের সমাজে একবার যদি তাকে জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে আর তার কোনও দুঃখ থাকবে না, নিজের মনের মতন বন্ধু-বান্ধবী ও নিজেই যোগাড় করে নিতে পারবে।

ও যে নিজেকে অভিজাত সমাজে বেশ ভালভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না। ওর মতন সুমার্জিত ব্যবহার অতি বড় সভ্য সমাজেও খুব বেশী পাওয়া যায় না।

কথাটা তুলতেই সে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল। তারপর একদিন বিকেলবেলা তাকে লতাদের বাড়ি নিয়ে গেলাম।

লতা তার গোলাপ বাগানে একটা ঝারি নিয়ে ফুলগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিল; আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সে একদৃষ্টে ললিতের মুখের পানে চেয়ে রইল। ললিত হাত তুলে নমস্কার করল। আমি দেখলাম, লতার হাতের ঝারিটা থেকে জল ঝ'রে তার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। আমি সাহিত্যিক মানুষ, আমার মনে একটা কবিত্বময় প্রশ্ন উদয় হ'ল—লতার পদমূলে অজ্ঞাতে যে-জল ঝরে পড়ছে তার ফলে লতার ফুল ধরবে নাকি?

সেদিন বেশীক্ষণ রইলাম না, লতা আর ললিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি চ'লে আসার কারণ আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কিছুদিন থেকে একটা উপন্যাসের প্লট আবছায়া ভাবে আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল; আজ লতার বাগানে, কি ক'রে জানি না, গল্পটাকে হঠাৎ আগাগোড়া চোখের সামনে দেখতে পেলাম। এমন আমার মাঝে মাঝে হয়; অবচেতন মন থেকে পরিপূর্ণ গল্পটি সমুদ্রোদ্ভবা উর্বশীর মতো উঠে আসে। তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হ'য়ে যায়।' আর কিছু ভাল লাগে না; আমার বাসার ছোট্ট ঘরে কাগজ-কলম-সাজানো একটি টেবিল আমাকে টানতে থাকে।

সে দিন চলে এলাম। তারপর কিছুদিন আর লতাদের ওদিকে যাওয়া ঘ'টে ওঠে নি। নিজের উপন্যাসে মগ্ন হয়ে আছি। ললিত মাঝে দু'একবার এসেছিল ; তার কাছে শুনলাম সে এখন ওদের সমাজে মিশে গেছে। এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল।

মাসচারেক পরে হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা ললিত এসে হাজির ; মুখে উত্তেজনা-ভরা হাসি। বলল—'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, আজ আমাদের ছবির উদ্বোধন। চলুন ইন্দুদা, আপনাকে দেখিয়ে আনি। বৌদি, আপনিও চলুন না।'

গিন্নী যেতে পারলেন না কোলের ছেলেটা বাল্‌সেছে ; আমি একাই ললিতের সঙ্গে গেলাম। তার মুখে আমার গানগুলো কেমন ওৎরালো শোনবার ইচ্ছে হল।

বেরুবার সময় ললিত গিন্নীকে ব'লে গেল—'ইন্দুদা ছবি দেখে আমার বাসাতে খাওয়া-দাওয়া ক'রে ফিরবেন। একটু রাত হবে, আপনি যেন ঘাবড়াবেন না।'

ছবিঘরে খুব ভিড় ; উদ্বোধন রজনীতে যেমন হয়ে থাকে। তখনও ছবি আরম্ভ হয় নি ; ললিত আমাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা বক্সে বসিয়ে দিলে। দেখলাম, বক্স আর ব্যাল্‌কনি অভিজাত সমাজের স্ত্রীপুরুষে ভরা। ললিত তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গল্পগাছা করতে লাগল। সে বেশ জমিয়ে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্য হলাম না ; ললিত যে-রকম মিষ্টি স্বভাবের ছেলে তাতে যে-কোনও সমাজে সে জনপ্রিয় হতে পারে।

ছবি আরম্ভ হল। দেখলাম ছবিটি ভালই হয়েছে, গানগুলি ললিতের মুখে বেশ মানিয়েছে। আর সব চেয়ে ভাল লাগল ললিতের সহজ সাবলাল অভিনয়। তার চেহারায় বোধহয় একটা জিনিষ আছে, যাকে ইংরাজিতে বলে sex appeal ; সেটা এক্ষেত্রে

মেয়েদের কাছেই বেশী ধরা পড়বার কথা, আমার আন্দাজ মাত্র। মোট কথা মেয়েরা যে তাকে খুবই পছন্দ করেছিলেন তার পরিচয় সে-রাত্রে পেলাম ; কিন্তু সে পরের কথা। ছবি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে ললিতের কপাল খুলেছে, এবার তাকে নিয়ে পরিচালক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

ছবি শেষ হলে ললিত আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। ললিতের বাসায় মাত্র একটি চাকর, সে-ই রান্নাবান্না করে। বাসায় পৌঁছে ললিত চাকরকে ছুটি দিয়ে দিলে ; চাকর রাত্রির শো'তে মালিকের ছবি দেখতে যাবে।

টেবিলের ওপর খাবার সাজানো ছিল, আমরা খেতে বসলাম। ললিতের বাসায় তিনটি ঘর—শোবার ঘর—বসবার ঘর আর ডাইনিং রুম। ঘরগুলি ভাঁরি সুরুচির সঙ্গে সাজানো। একটু বিলিতী ঘেঁষা কিন্তু উৎকট সাহেবিয়ানা নেই ; দেশী আরামের সঙ্গে বিলিতী পরিচ্ছন্নতা মিশেছে ; ভারি ভাল লাগল।

খেতে বসে ললিত খুব উৎসাহ আর উত্তেজনার সঙ্গে কথা কইতে লাগল। নবলব্ধ সিদ্ধি আর খ্যাতি মানুষকে আনন্দে অধীর করে তোলে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সে তার উদ্দীপ্ত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে! থেকে থেকে একটা অস্বস্তির ভাব তার মুখে ফুটে উঠছে। কিছু বুঝতে পারলাম না ; ভাবলাম ললিত ভারি বিনয়ী ছেলে, অহঙ্কারের লেশমাত্র তার শরীরে নেই ; তাই সে এই হঠাৎ পাওয়া গৌরব হজম করতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না' ; ললিতের মনের অবস্থাও বোধহয় অনেকটা সেই রকম।

খাওয়া শেষ করে উঠতে পৌনে এগারোটা বাজল। ভাবলাম, আর দেরি নয়, এবার উঠে পড়ি ; কিন্তু ললিত কোথা থেকে

এক গড়গড়া যোগাড় করেছিল; খাম্বিরা তামাক সেজে যখন গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিলে তখন আর উঠতে পারলাম না। বসবার ঘরে কৌচের ওপর আড় হয়ে আবার গল্প আরম্ভ হল।

তারপর কখন এগারোটা বেজে গেছে; আমাদের আগড়ম বাগড়ম গল্প চলেছে। হঠাৎ এক সময় ললিত জিগ্যেস করল—'ইন্দুদা, আজ সিনেমায় লতাকে দেখেছিলেন?'

আমি বললাম—'লতাকে? কৈ না। সে এসেছিল নাকি?'

ললিত বলল—'হুঁ। আমার বড় ভয় করছে, ইন্দুদা। সে হয়তো একটা কাণ্ড ক'রে বসবে।'

উঠে বসে বললাম—'কী কাণ্ড ক'রে বসবে? তোমাদের ব্যাপার তো আমি কিছুই জানি না। সব খুলে বল।'

ললিত একটা ঢোক গিলে বলল—'আপনি তো লতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চ'লে এলেন। তারপর—তারপর অনেক ব্যাপার ঘটেছে।'

ললিতকে জেরা করে সব কথা বার করতে হল। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই লতার সমস্ত মন ললিতের ওপর গিয়ে পড়ে; যেন এতদিন ললিতের জন্যই সে পথ চেয়ে ছিল। লতা মনের কথা গোপন করতে পারে না, চেষ্টাও নেই। অল্পদিনের মধ্যেই ললিত বুঝতে পারল লতা তাকে পাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। ললিতের অবস্থা শোচনীয়। ললিত লতাকে খুবই পছন্দ করে; কিন্তু লতার দুরন্ত হৃদয়াবেগ দেখে তার ভয় করে—সে লতাকে এড়িয়ে চলে। আজ সিনেমায় ছবি শেষ হবার পর ক্ষণেকের জন্য তাদের দেখা হয়েছিল; লতা এমনভাবে একদৃষ্টে তার মুখের পানে তাকিয়েছিল যে ললিতের ভয় হয়েছিল বুঝি শহরসুদ্ধ লোকের সামনে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে বসে। প্রবল নেশায়

মানুষের যেমন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না লতার চোখে সেই দৃষ্টি। দু'একটা কথা বলেই ললিত পালিয়ে এসেছে।

ভালবাসার পাত্রকে নাটকের নায়করূপে দেখলে বোধ হয় অনুরাগ আরও বেড়ে যায়। সব শুনে আমি বললাম—'কিন্তু তোমার পালিয়ে বেড়াবার কী দরকার বুঝতে পারছি না। লতা যখন তোমাকে বিয়ে করতে চায় তখন তাকে বিয়ে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তাকে তো তোমার অপছন্দ নয়?'

ললিত বলল—'আপনি বুঝছেন না ইন্দুদা। লতা খুব ভাল মেয়ে, তার মনে ছলা-কলা নেই—তাকে আমার বড্ড ভাল লাগে; কিন্তু ভাল লাগলেই তো চলে না। লতা বড় ঘরের মেয়ে, বড় মানুষের মেয়ে; আর আমি সিনেমা অ্যাক্টর। আমি কোন্ মুখে লতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করব? তিনি বোধহয় লতার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন, আজকাল আমাকে দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তা থেকেই বুঝতে পারি আমাকে তিনি লতার উপযুক্ত পাত্র মনে করেন না, হয় তো লতাকে আমার সঙ্গে মিশতে দিয়ে মনে মনে পস্তাচ্ছেন—'

এই সময় ঘড়ির ওপর চোখ পড়ল, দেখি সাড়ে এগারোটা। লতা এবং ললিতের প্রসঙ্গ খুবই জটিল হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু আর দেরী করা চলে না। আমি উঠে পড়লাম, বললাম—'দিব্যি জট পাকিয়েছ দেখছি। রাতারাতি এ জট ছাড়ানো যাবে না, একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে। আজ উঠি।'

ললিত আমার হাত ধ'রে মিনতি করে বলল—'আজ রাত্তিরটা থেকে যান না ইন্দুদা, কাল সকালে বাড়ি যাবেন। কত কথা যে বলবার আছে, আপনাকে বললে মনে বল পাব—'

বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমাকে মাথা নেড়ে

বলতে হল—'না ভাই, তোমার বৌদি ভীতু মানুষ আমি না ফিরলে সারারাত্রি ছেলে কোলে ক'রে বসে থাকবে। আজ ফিরতেই হবে।'

কিন্তু এত সহজে ফেরা হল না। চাদরটি গলায় দিয়ে বেরুবার উপক্রম করছি এমন সময় দরজায় খুট্ খুট্ করে টোকা পড়ল।

ললিত চমকে উঠে বলল—'কে?'

দরজার ওপার থেকে কিছুক্ষণ জবাব নেই; তারপর চাপা গলায় আওয়াজ এল—'দোর খোল—আমি লতা।'

ঘরের মাঝখানে বজ্রপাত হলেও এমন স্তম্ভিত হতাম না। লতা! এই রাত্রে লতা এসেছে ললিতের নির্জন বাসায়? ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালাম ললিতের মুখের পানে; সেও ফ্যাল ফ্যাল করে আমার পানে তাকালো। তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল—'কী করি আমি এখন?' তার ভাব দেখে মনে হল যেন সে চোর, কোণ-ঠাঁসা হয়েছে!

আমি বললাম—'দোর খুলে দাও—আর উপায় নেই। আমি পাশের ঘরে লুকোচ্ছি। আমাকে দেখলে লতা লজ্জা পাবে।'

আমি ললিতের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ... দী হলেও
ওঘর থেকে শব্দ পেলাম, ললিত সদর দরজা খুলে ... । বললাম—
দরজা আবার বন্ধ হল। তারপর আর সাড়াশ... তুমি নিতে তাহলে
আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বোকার মতো ... খোলা আছে—'
হঠাৎ নজরে পড়ল দরজার চাবির ফুটো দি... উঠল। সে আমাকে
লোভ সামলাতে পারলাম না। ... এমন ছোটলোক মনে
ললিত দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, ... নেই আমার শরীরে?
সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে
বিদ্যুৎ বাতির লজ্জাবিদারী আলো ... ব'লে আমি চলে এলাম।

ভুলব না। আমি সাহিত্যিক, প্রেম নিয়েই আমার কারবার; কিন্তু এমন তীব্র সর্বগ্রাসী প্রেম যে মানুষ অনুভব করতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি, তবু আমারই যেন দম বন্ধ হয়ে হয়ে আসবার উপক্রম হল।

তারপর লতা ছুটে গিয়ে ললিতের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তারপর—সে কী চুম্বন! বিলিতী সিনেমাতেও এমন চুম্বন কখনও দেখি নি; যেমন দীর্ঘ তেমনি জ্বালাময়। অভিনয়ে ও জিনিষ হয় না; একটি চুম্বনে নিজেকে সর্বস্বান্ত ক'রে বিলিয়ে দেওয়া বাস্তবেও কদাচিৎ হয়।

ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হল।

কিছুক্ষণ কাটবার পর দু'জনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়—ছাড়া-ছাড়া ভাঙা-ভাঙা—লতাই বেশী কথা বলছে···

তুমি আমাকে চাও না?···একটুও ভালবাসো না? কিন্তু আমি উঁ যে তোমাকে···

দিয়ে মনে বলছে···লতা, আমি তোমাকে ভালবাসি···তোমাকে বিয়ে এই সময় মুই···কিন্তু তোমার বাবা···

লতা এবং ললিতে কখনও চোখ লাগাচ্ছি, কখনও কান। লতা দু'হাত আর দেরী করা চলে না জড়িয়ে ধরেছে, ললিতও একটা হাত দিয়ে জট পাকিয়েছ দেখছি। ধরেছে; মুখোমুখি কথা হচ্চে—তা বলছে··· একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে তোমার কাছে থাকব···তাহলে তো ললিত আমার হাত ধ'রে পারবেন না···আমার লজ্জা নেই, কিচ্ছু থেকে যান না ইন্দুদা, কাল থাকব—

যে বলবার আছে, আপনাকে র ঘরের দোরের দিকে তাকালো। বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে বললো। লতাও বিস্ফারিত চোখে

দোরের দিকে তাকালো, তারপর ক্ষোভে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। বুঝলাম, আমার কথা হচ্চে—

ফুটো থেকে সরে গিয়ে ললিতের বিছানর ওপর বসলাম। যুবক যুবতীর দুর্বার হৃদয়াবেগ বেশী বয়সে সহ্য হয় না, স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, মিনিট পাঁচেক বসে থাকবার পর সদর দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরে ললিতের ভাঙা গলার আওয়াজ এল—'ইন্দুদা, বেরিয়ে আসুন, লতা চলে গেছে।'

তখন বারোটা বেজে গেছে। বেরিয়ে এসে দেখলাম ললিতের মুখখানা ফ্যাকাসে। সে কোচের ওপর বসে পড়ল, কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল—'এই ভয়ই আমি করেছিলাম ইন্দুদা; কিন্তু এখন উপায় কি বলুন।'

বললাম—'বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই।'

'লতার বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'চেষ্টা করব; কিন্তু আমি জানি তিনি রাজী হবেন না। তার-পর কি করব?'

আমি একটু অধীর হয়ে পড়লাম। মনে মনে আদর্শবাদী হলেও আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করা আমার সহ্য হয় না। বললাম—'লতা তোমাকে যে সুযোগ দিয়েছিল তা যদি তুমি নিতে তাহলে সব সমস্যাই সহজ হয়ে যেত। এখনও সে পথ খোলা আছে—'

ললিতের ফ্যাকাসে মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। সে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল—'ছি ইন্দুদা, আমাকে এমন ছোটলোক মনে করেন আপনি? বাপ-পিতাম'র রক্ত নেই আমার শরীরে? ম'রে গেলেও আমি তা পারব না।'

'তবে আর কোনও উপায় নেই।' ব'লে আমি চলে এলাম।

ললিত সে রাত্রে যে ব্যবহার করেছিল তা[illegible] জন্যে তাকে নিন্দে করবার কথা বোধহয় কারুর মনে উদয় হবে না; তার রক্তে বহু পূর্বপুরুষের সঞ্চিত শুচিতা তাকে যে শক্তি দিয়েছিল সে শক্তি সকলের নেই তা আমি জানি; কিন্তু তবু আমার মনটা সন্তুষ্ট হ'তে পারল না। লতা আর ললিতকে আমিই একত্র করেছিলাম; তাদের মন নিয়ে আজ যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে খানিকটা দায়িত্ব আমার আছেই। অথচ এই জটিলতার গ্রন্থিচ্ছেদ কি করে করব ভেবে পেলাম না। লতার ব্যবহার আমি সমর্থন করি না, তাকে আদর্শ মেয়ে বলেও মনে করি না; কিন্তু তাকে ঘৃণা করবার মতো মনের জোরও আমার নেই। তার ঐকান্তিক আত্ম-বিস্মৃতি একটি সুখময় সৌরভের মতো চিরদিন আমার মনে গাঁথা হয়ে থাকবে; কিন্তু ওদের মিলন ঘটাবার জন্যে আমি কি করতে পারি? লতার বাবাকে আম[illegible] কোনও কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, যদি আমি ললিতের বাসায় এত রাত্রি পর্যন্ত না থাকতাম তাহলে হয়তো জৈব নিয়মে সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যে[illegible]—বিধা[illegible]র ঘূর্ণি হাওয়া যেমন নিজের প্রচণ্ডতার বলেই পৃথিবীর বদ্ধ কলুষভরা আবহাওয়াকে পরিষ্কার ক'রে দেয় তেমনি ওদের জীবনের গুমটও কেটে যেত; কিন্তু বিধাতার বোধ হয় তা ইচ্ছে নয়।

এদিকে আমার ভাগ্যেও যে বিধাতার ঘূর্ণি হাওয়া ঘনিয়ে এসেছে তা তখনও টের পাই নি। দু'চার দিন কেটে গেল; ললিতা বা লতার আর দেখা নেই। এদিকে উপন্যাসখানা শেষ করে ফেলেছি. এমন সময় বোম্বাই থেকে ডাক এল। ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের পাতা যেমন বোঁটা থেকে ছিঁড়ে উড়ে যায়, আমি তেমনি উড়ে এসে বোম্বাইয়ে পড়লাম। সেই থেকে বোম্বাইয়ে আছি। ইতিমধ্যে

লতা বা ললিতের আর কোনও খবর পাই নি। তাদের জীবনের পরম সমস্যা কি করে সমাধান হল, অথবা সমাধান হল কিনা তার কিছুই জানি না।

কয়েক মাস আগে একবার কলকাতা যেতে হয়েছিল; গিয়ে দিন দশেক ছিলাম।

একদিন সকালবেলা ললিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ললিত এখন মস্ত আর্টিষ্ট, অনেক টাকা রোজগার করে; কিন্তু সেই পুরাণো বাসাতেই আছে।

আমি গিয়ে দেখি, ললিত সবে ঘুমিয়ে উঠেছে; চুল উস্কখুস্ক দাড়ি কামায় নি, বসবার ঘরে একলা চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধূলো নিলে।

ললিতের ঘরের আর সে ছিমছাম ভাব নেই। ললিতও এই পাঁচ বছরে অনেক বদলে গেছে। চেহারা যে খুব খারাপ হয়েছে তা নয়, কিন্তু কান্তি নেই। সব চেয়ে বেশী পরিবর্তন হয়েছে তার মনে; আগে যা তালশাঁসের মতো কচি ছিল তাই আঁটির মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনটাই আগে চোখে পড়ে।

ললিত প্রথমে আমার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করল, অভিনয় করতে লাগল যেন সে আগের মতোই আছে; কিন্তু অভিনয় বেশীক্ষণ টিকল না, হঠাৎ এক সময় ভেঙে পড়ল। সে বলল—'ইন্দুদা, আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। আমি বয়ে গেছি—মদ ধরেছি।' এই বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

বুঝতে আমি পেরেছিলাম। শুধু মদ নয়, সব রকম দোষই তার হয়েছে; কিন্তু তবু সে বেপরোয়া বেলেল্লা হয়ে যায় নি। আদর্শ ভ্রষ্ট হওয়ার লজ্জা আর ধিক্কার তার মনে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হয়ে সে আস্তে আস্তে সব কথা বলল। লতার বাবার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কিন্তু তিনি রাজি হন নি। তারপর হঠাৎ একদিন লতাকে নিয়ে তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন। মাস ছয়েক আর তাঁদের কোনও খোঁজ খবর ললিত পায় নি। ছ'মাস পরে একেবারে মেয়ে জামাই নিয়ে লতার বাবা দেশে ফিরে এলেন। জামাই একজন নবীন বার-অ্যাট্-ল।

লতার বাবার বিচিত্র কথা ভাবতে লাগলাম। বিপদে পড়লেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে। তিনি কম বয়সে সাহেবিয়ানা করেছিলেন; মাঝে রক্তের জোর কমবার পর দেশের পুরোনো সংস্কৃতি তাঁকে টেনেছিল; কিন্তু যেই তিনি বিপদে পড়লেন অমনি ছুটে গেলেন যৌবনের পরিচিত ক্ষেত্রে। দলের পাখী একটু শঙ্কিত হলেই নিজের দলে ফিরে যেতে চায়।

লতার সঙ্গে তারপর আর ললিতের দেখা হয় নি। সমাজে মেশা ললিত ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম কিছুদিন সে বেশ ... ছিল। তারপর একদিন কখন্ তার মনের মধ্যে একটা সূতো ছিঁড়ে গেল, সংস্কার আর তাকে তার আদর্শের কোলে ধরে রাখতে পারল না; বাপ পিতামহের রক্ত ভেসে গেল। মন যতই শক্ত হোক, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন সময় আসে যখন মনে হয়—বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ, মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

যেদিন ললিত লতাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন তার বিচার করি নি; আজও তাকে বিচার করবার স্পর্দ্ধা হল না। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি, ললিত হঠাৎ বলল,—'আচ্ছা ইন্দুদা, সে-রাত্রে যদি লতার কথা শুনতাম তাহলেই বোধহয় ভাল হত—না? অন্তত বয়ে যেতাম না।'

আমি বললাম—'ভাই, এ দুনিয়ায় কিসে যে ভাল হয় আর কিসে

মন্দ হয় তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি। তবে দেখেছি, বেশীর ভাগ সময়েই ভাল করলে মন্দ হয়; কিন্তু তা বলে সবাই মিলে মন্দ করলেই যে মানবজাতি উদ্ধার হয়ে যাবে এ বিশ্বাসও আমার নেই। গীতায় শ্রীভগবানই খাঁটি কথা বলেছেন—মা ফলেষু।'

দোর পর্যন্ত এসে জিগ্যেস করলাম—'লতারা কোথায় আছে জানো?'

ললিত বলল—'শুনেছি ল্যান্স্‌ডাউন রোডের বাড়িতেই আছে। লতার বাবা বিলেত থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই মারা গেছেন।' এই বলে সে একটু তিক্ত হাসল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ল্যান্স্‌ডাউন রোডের বাড়িতে লতাকে দেখতে গেলাম।

বাড়ি বাগান ঠিক আগের মতোই আছে, কিচ্ছু বদলায় নি। লতাও ঠিক তেমনি আছে, তার স্বভাবে কোনও পরিবর্তন হয় নি। শুধু এই কয় বছরে তার দেহ-মন আরও পরিণত হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে।

আমাকে আগের চেয়েও বেশী আদর যত্ন করল। কত কথা জিজ্ঞাসা করল—বোম্বাইয়ে কেমন আছি—কি করচি—কত টাকা রোজগার করি—এই সব। আমাকে অনেকদিন পরে পেয়ে তার যেন আনন্দ ধরে না। সরল প্রাণের অকুণ্ঠ আনন্দ।

কিছুক্ষণ পরে একটি বছর তিনেকের মেয়ে ছুটে এসে তার হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়ালো। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি, লতার মতো নির্ভীক স্বচ্ছ দুটি চোখ। লতা বলল—'আমার মেয়ে। ওর নাম ললিতা।'

আমি চম্‌কে লতার মুখের পানে তাকালাম। লতা আমার চোখের চকিত প্রশ্ন বুঝতে পারল; একটু হেসে মাথা নেড়ে

বলল—'আপনি যা ভাবছেন তা নয়—ও আমার স্বামীর মেয়ে।' আমার কান লাল হয়ে উঠল। লতা তখন মেয়েকে বলল—'যাও ললি, খেলা করগে।'

ললিতা চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি সঙ্কুচিত-ভাবে বললাম—'লতা, যা হতে পারত তার জন্যে তোমার মনে কি কোনও দুঃখ নেই?'

লতা সরলভাবে বলল—'আগে ছিল এখন আর নেই। যা পাব না তার জন্যে কেঁদে কি হবে মাষ্টারমশাই? কিন্তু ভুলি নি। ভুলতে চাইও না। তাই মেয়ের নাম রেখেছি ললিতা।'

তবু আবার জিগ্যেস করলাম—'তুমি মনের সুখে আছ?'

সে একটু যেন অবাক হয়ে বলল—'মনের সুখে থাকব না কেন?'

তারপর লতার স্বামী এলেন। ঢিলা পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরা সুপুরুষ যুবক। লতা পরিচয় করিয়ে দিল 'ইনি আমার মাষ্টারমশাই—এঁর কথা তোমাকে বলেছি—' বলে এমন ভাবে স্বামীর মুখের পানে তাকালো যে বুঝতে পারলাম, সেই রাত্রির কথাও লতা স্বামীর কাছে গোপন রাখে নি।

লতার স্বামী হাসিমুখে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। শেষে স্ত্রীকে বললেন—'লতা, ওঁকে সহজে ছেড় না, রাত্রে ডিনার খেয়ে যাবেন। আমার এখন থাকবার উপায় নেই, বাইরের ঘরে মক্কেল বসে আছে; কিন্তু ওঁকে যদি গান গাইতে রাজি করতে পার তাহলে আমি যেন বঞ্চিত না হই। বাইরে খবর পাঠিও।'

সে-রাত্রে ডিনার খেয়ে তবে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেলাম। লতা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত সেদিন আমার গলা দিয়ে বেরুল না। রামপ্রসাদের 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' গেয়ে ফিরে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্যাড্ সঙ্

এক

যে কাজ করিয়া মানুষ নিজে আনন্দ পায় এবং অন্যকে আনন্দ দিতে পারে, সে-কাজের একটা বিচিত্র নেশা আছে। উপরন্তু সেই কাজে যদি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা। এরূপ কাজ করিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সোমনাথ নিজের কাজে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল; সিনেমা জগৎ একান্তভাবে তাহার নিজের জগৎ হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের চিন্তা তাহার মনে বড় একটা আসিত না। কদাচিৎ রত্নার কথা মনে আসিলেও সে তাহা জোর করিয়া দূরে সরাইয়া দিত। রত্না প্রাংশুলভ্য ফল, তাহার চিন্তায় উদ্বাহু হইয়া থাকিলে গাছের ফল মাটিতে পড়িবে না, কেবল মন খারাপ হইবে মাত্র। তার চেয়ে ববং যে-ফল ভাগ্যদেবী তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন তাহাই প্রসন্নমনে বহুমানে গ্রহণ করাই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা।

সোমনাথের পরিচালনায় প্রথম ছবি বাহির হইবার পর বৎসরের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ছবি বাহির হইয়া প্রথমটির মতোই জনপ্রিয় হইয়াছে। সোমনাথ এখন তৃতীয় ছবির শূটিং লইয়া ব্যস্ত।

মাঘ মাসের আরম্ভ।

পৌষ মাঘ মাসে শীত পড়িবার কথা; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে

সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে শীত বলিয়া কিছু পড়ে না; আমাদের দেশে আশ্বিন-কার্তিক মাসে যেরূপ ঠাণ্ডা পড়ে, সেইরূপ একটু মোলায়েম ঠাণ্ডা দেখা দেয় মাত্র; কিন্তু এ দেশের লোক, বোধ করি শীত ঋতুর মর্যাদা রক্ষার জন্যই, এই সময় মোটা মোটা গরম জামা পরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে লেপ গায়ে দেয়।

ছবির শূটিং করার পক্ষে এই সময়টি অতি মনোরম; যদিও শনিবারে কোনও কাজ হয় না। শনিবারে মহালক্ষ্মীর মাঠে ঘোড়দৌড়; সেদিন সিনেমা সম্পর্কিত নরনারীর মন এবং পদদ্বয় অজ্ঞাতসারেই মাঠের অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সিনেমার ষ্টুডিও-গুলি অধিকাংশই শনিবারে কাজ বন্ধ রাখিয়া রবিবারে কাজ করে।

এইরূপ একটা শনিবারে সোমনাথ ও পাণ্ডুরঙ্‌ ষ্টুডিওর অফিস ঘরে বসিয়া অলসভাবে গল্প করিতেছিল। শূটিং-এর কাজ সতৈল যন্ত্রের মতো নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছন্দতার সহিত চলিতেছে; আজ তাহাদের ষ্টুডিওতে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু অভ্যাসের টানে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অলস বাক্যালাপে দিনটা কাটাইয়া দিতেছে। ঘোড়দৌড়ের প্রতি তাহাদের আসক্তি ছিল না।

অপরাহ্ণের দিকে একটি লোক দেখা করিতে আসিল। লোকটির নাম কুঞ্জবিহারী লাল। ভারী গড়ন, মাংসল মুখ, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু মাথার চুল অর্ধেক পাকিয়া গিয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া খুব বুদ্ধিমান মনে হয় না; বড় বড় চোখে যেন একটা অসহায় হারাইয়া-যাওয়া ভাব। তাহার বেশবাস দেখিয়া তার আর্থিক অবস্থাও সমৃদ্ধ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে না।

কুঞ্জবিহারী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই পাণ্ডুরঙ্‌ বলিয়া

উঠিল—'আরে কুঞ্জবিহারী! কি খবর তোমার?'

কুঞ্জবিহারী হাসিয়া বলিল—'এই আপনাদের কাছে এলাম, যদি কোনও কাজ-টাজ থাকে—'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল…'কিন্তু শুনেছিলাম তুমি সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলেছ।'

কুঞ্জবিহারী একটু লজ্জিতভাবে বলিল—''মুদির দোকান খুলেছিলাম সত্যি; কিন্তু বন্ধুবান্ধব সবাই ধারে জিনিষ নিতে লাগল, তারপর টাকা দিলে না। দোকান উঠে গেল। তাই এখন আবার সিনেমায় ফিরে এসেছি। পেট তো চালাতে হবে, যোশীজি।' তারপর সোমনাথকে বলিল—'আপনি নতুন ছবি আরম্ভ করেছেন, ভাবলাম খোঁজ নিয়ে আসি আমার জন্যে ছোট খাটো পার্ট যদি কিছু থাকে।'

সোমনাথ পাণ্ডুরঙের পানে তাকাইল, উত্তরে পাণ্ডুরঙ্ একটু ঘাড় নাড়িয়া সঙ্কেত করিল যে কুঞ্জবিহারীকে লওয়া যাইতে পারে।

সোমনাথ তখন বলিল—'সব পার্টই প্রায় বিলি হয়ে গেছে। আপনি কাল আসবেন, দেখি যদি কিছু দিতে পারি।'

কুঞ্জবিহারী প্রস্থান করিলে সোমনাথ বলিল—'কি বল পাণ্ডুরঙ্? দুটি পার্টের এখনও লোক নেওয়া হয় নি, এক পাগলের পার্ট, আর এক পুলিস ইন্সপেক্টর। তোমার কুঁজবিহারী অভিনয় করে কেমন?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'চলনসই।'

'পাগলের পার্ট ছোট হলেও শক্ত; ভাল লোক চাই। ও ইন্সপেক্টরই করুক তাহলে।'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর কোনও রকমে চালিয়ে দেবে। কুঁজবিহারী অভিনয়ের বড় কিছু বোঝে না, কিন্তু লোকটা ভাল। এখন

অনেক বদলে গেছে; সাতবছর আগে প্রথম যখন সিনেমায় ঢুকেছিল তখন ওর চরিত্র অন্যরকম ছিল—আরও উৎসাহ ছিল, উচ্চাশা ছিল—এখন যেন একেবারে নিভে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ওর জীবনের যতটুকু জানি তাতে বেশ একটি মজার ট্রাজিকমেডি হয়, কমেডির ভাগই বেশী। কে জানে, হয় তো সব মানুষের জীবনই তাই, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না—'

গল্প আসন্ন বুঝিয়া সোমনাথ দুই পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিল।

অতঃপর চা পান করিতে করিতে পাণ্ডুরঙ্ কুঁজবিহারীর জীবনের যে কাহিনী বলিল তাহা এই—

কুঁজবিহারী হায়দ্রাবাদের লোক। পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, লেখা-পড়া বেশী শেখে নি। প্রথম যখন বোম্বাই এসেছিল তখন শহুরে আদব কায়দাও ভাল জানতো না; কিন্তু কী তার আগ্রহ, কী তার উৎসাহ! তার দেহাতি ভাব দেখে হাসি পেলেও তার আগ্রহ আর উত্তেজনাকে এড়াবার উপায় ছিল না। সিনেমায় হিরোর পার্ট করবে বলে সে বোম্বাই এসেছিল, হিরোর পার্ট না ক'রে সে ছাড়বে না।

তখন কুঁজবিহারীর বয়স কম ছিল। মাথার চুল পাকে নি, চেহারাও ওরই মধ্যে ছিমছাম। কোনও রকম বদ্ খেয়াল ছিল না; একটা চৌলে ঘর ভাড়া ক'রে থাকত, আর ষ্টুডিওতে ষ্টুডিওতে হিরো হবার উমেদারি ক'রে বেড়াতো।

কিন্তু হিরো সাজতে গেলে গুণ চাই, নয় তো মুরুব্বি চাই। কুঁজ-বিহারীর কোনটাই ছিল না। তাই তাকে হিরোর পার্ট দিতে কেউ রাজি হল না। বাধ্য হয়ে কুঁজবিহারী ছোটখাট পার্ট করতে লাগল; কিন্তু সে আশা ছাড়ল না; হিরো সাজবার অবিচলিত

লক্ষ্য নিয়ে জোঁকের মতো লেগে রইল।

আমি তখনও পিলের ষ্টুডিওতে ঢুকি নি; কোথাও বাঁধা কাজ করি না। সব ষ্টুডিওতেই যাতায়াত ছিল। যেখানেই যেতাম, দেখতাম ডিরেক্টরের কাছে কুঁজবিহারী গরুড় পক্ষীর মতো বসে আছে। সব ডিরেক্টরই মনে মনে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আমাদের ডিরেক্টরদের আর যে দোষই থাক না কেন, মোসায়েবকে স্পষ্ট কথা বলে বিদেয় করে দেবে এমন লোক তারা নয়। কুঁজ-বিহারীও অস্পষ্ট আশ্বাসের মিথ্যে কুহকে ভুলে তাদের পিছনে লেগে রইল।

এই ভাবে বছর তিনেক কেটে গেল।

সিনেমা সমাজের সবাই খোলাখুলি ভাবে কুঁজবিহারীকে টিট্‌কিরি দিত; কিন্তু সে গায়ে মাখত না। আমার সঙ্গে তার খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু আমি কোনও দিন তাকে টিট্‌কিরি দিই নি বলেই বোধ হয় সে মাঝে মাঝে আমার কাছে তার মনের কথা বলত। কখনও বলত—'যোশীজি, এবার সব ঠিক হয়ে গেছে; অমুক ডিরেক্টর পরের ছবিতে আমাকে হিরোর পার্ট দেবেন বলেছেন। তাঁর মেয়ের বিয়েতে আপনি তো গিয়েছিলেন; দেখেছিলেন তো আমার হাতেই তিনি সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার ওপর খুব খুশী হয়েছেন। এবার আর ফস্কাবে না।' আবার কখনও বলত—'অমুক ডিরেক্টর বলেছেন, পরের ছবিতে ঠিক আমার মতো চেহারার হিরো তাঁর চাই। এ ছবিতে তাই তাঁর খাতিরে ছোট পার্ট ক'রে দিচ্ছি।'

তার কথা শুনে হাসিও পেতো, আবার সবাই মিলে তাকে বানর বানাচ্ছে দেখে রাগও হত। একদিন আর থাকতে না পেরে আমি বললাম—'ছাখো কুঁজবিহারী, একটি কাজ যদি করো তা

হলেই তুমি হিরো হতে পারবে, নইলে কোনও আশা নেই।'

আগ্রহভরে কুঁজবিহারী বলল—'কি কাজ ?'

বললাম—'দেখেশুনে একটি সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে ফ্যালো। তবেই তোমার বরাত ফিরবে।'

কুঁজবিহারী ভর্ৎসনার সুরে বলল—'যোশীজি, আপনিও আমাকে ঠাট্টা করছেন ?'

বললাম—'ঠাট্টা করি নি, সত্যি কথা বলছি।' দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই ছিল দু' তিনটে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম—'এরা কী করে বড় হল ? স্রেফ্ বৌয়ের জোরে। তুমিও যদি ত্রিভুবন-বিজয়ী হতে চাও, তাহলে লজ্জা ত্যাগ করতে হবে।'

কথাটা যে কুঁজবিহারীর মনে ধরেছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস ছয়েক পরে। মাঝে কয়েক মাস তার দেখা পাই নি, ভেবেছিলাম সে বুঝি হতাশ হয়ে সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ একদিন একটা ষ্টুডিওতে গিয়ে দেখি, কুঁজবিহারী বসে আছে, তার সঙ্গে একটি তরুণী।

কুঁজবিহারীর মুখে গালভরা হাসি। আমাকে দেখে সগর্বে পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি আমার স্ত্রী—রোহিণী দেবী।'

রোহিণী দেবীর চেহারার চটক আছে, চোখে চটুল চাউনি, বয়স উনিশ-কুড়ি। তাকে সিনেমা ক্ষেত্রে আগে কখনও দেখি নি; অবাক হয়ে গেলাম।

কুঁজবিহারীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—'এটিকে কোত্থেকে যোগাড় করলে ?'

কুঁজবিহারী তখন তার স্ত্রী সংগ্রহের ইতিহাস বলল।

রোহিণী কুঁজবিহারীর গাঁয়ের মেয়ে—বিধবা। গাঁয়ের মেয়ে হলেও মনটা তার ছিল শহুরে—প্রগতিপন্থী। তার মামার বাড়ি শহরে,

প্রায়ই সে মামার বাড়ি যেত, শহরের আবহাওয়াতে আধুনিক দুনিয়ার পরিচয় পেয়েছিল—ঘুরিয়ে কাপড় পরতে পারতো, গান গাইতে শিখেছিল—

রোহিণীর গানের কথায় কুঁজবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—'ওর স্যাড্ সঙ্ যদি একবার শোনেন, যোশীজি, গলে যাবেন। অমন স্যাড্ সঙ্ সিনেমায় আর কেউ গাইতে পারে না।'

গাঁয়ের রসিক ছোকরারা রোহিণীর স্যাড্ সঙ্ শুনেছিল, সকলেরই তার ওপর নজর ছিল; কিন্তু বিধবাকে বিয়ে করতে কেউ রাজি ছিল না। তাই রোহিণীর জীবন যৌবন স্যাড্ সঙ্ সবই গাঁয়ের আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় কুঁজবিহারী গাঁয়ে ফিরে গেল। রোহিণীর সঙ্গে তার দেখা হল, স্যাড্ সঙ্ শুনে সে গলে গেল। আমি কুঁজবিহারীর মস্তিষ্কে যে বীজ বপন করেছিলাম তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু গাঁয়ে কুঁজবিহারীর খুড়ো আছেন, তিনি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে মার—মার করে উঠলেন। গাঁয়ের মোড়ল তিনি, এমন অনাচার কখনই ঘটতে দেবেন না। রোহিণীর বাপের মনে যদি বা একটু ইচ্ছে ছিল, বেগতিক দেখে তিনিও রুখে দাঁড়ালেন, মেয়েকে দু'এক ঘা শাসন করলেন।

কুঁজবিহারী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাকে সিনেমার হিরো সাজতে হবে, রোহিণীর মতো একটি বৌ তার চাইই। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখা শোনা হতে লাগল। রোহিণীও সিনেমার নামে পাগল। মিঞা বিবি রাজি, কাজেই কাজীরা আর কী করবেন? একদিন গভীর রাত্রে কুঁজবিহারী রোহিণীকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এল।

তারপর শহরে এসে আর্য সমাজী মতে তাদের বিয়ে হয়েছে।

আমি কুঁজবিহারীর পিঠ চাপড়ে বললাম—'সাবাস, এবার আর কেউ তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

তারপর কুঁজবিহারী মহা উৎসাহে স্ত্রীকে নিয়ে ষ্টুডিওতে ষ্টুডিওতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেখানে যাই, দেখি সস্ত্রীক কুঁজবিহারী উপস্থিত; কখনও ওজস্বিনী ভাষায় ডিরেক্টরকে স্যাড্ সঙের মহিমা বোঝাচ্ছে, কখনও বা প্রডিউসারকে রোহিণী দেবীর গান শোনাতে গিয়ে নিজেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছে। রোহিণীর গলাটি অবশ্য মন্দ নয়। তবে অশিক্ষিত গলা; মাজলে ঘষলে ভালই দাঁড়াতো।

দেখলাম ডিরেক্টরেরা বেশ নরম হয়েছেন; রোহিণীকে হিরোইনের ভূমিকায় ট্রাই দিতে অনেকেরই আপত্তি নেই; কিন্তু এদিকে কুঁজবিহারী বদ্ধপরিকর; নিজে হিরোর পার্ট না পেলে সে রোহিণীকে হিরোইনের পার্ট করতে দেবে না। ডিরেক্টরেরা কাজেই পিছিয়ে যাচ্ছেন। কুঁজবিহারীকে হিরো করার মতো বুকের পাটা কারুর নেই।

কয়েক মাস এইভাবে কাটল। কুঁজবিহারীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। একদিন সে গাল-ভরা হাসি নিয়ে বলল—'সব ঠিক করে ফেলেছি, যোশীজি। আসছে হপ্তায় আমার ছবির মহরত।'

বললাম—'বল কি! কার ঘাড় মট্‌কালে?'

কুঁজবিহারী বলল—'একজন ফিনানশিয়ার পাক্‌ড়েছি।'

'বেশ বেশ। শেষ পর্যন্ত হিরো হয়ে তবে ছাড়লে!'

সে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল—'একটু গোলমাল হয়েছে, এ ছবিতে আমি হিরো হব না। আমি ছবি ডিরেক্ট করব।'

'সে তো আরও ভাল। রোহিণী দেবী হিরোইন সাজবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর হিরো ?'

'ফিনান্‌শিয়ারের ছেলেকে এবার হিরোর পার্ট দিতে হবে। তার বাবা টাকা দিচ্ছে—তাই—বুঝতেই সে পারছেন। এই একটা ছবি হয়ে যাক না, কিছু টাকা জমিয়ে নিই, তারপর নতুন কোম্পানী খুলব। কোম্পানীর নাম দেব কুঁজরোহিণী চিত্রশালা। তখন—'

সিনেমার সোনার খনির খাদে যাদের বাস, সোনালি স্বপ্ন দেখা তাদের অভ্যাস; কিন্তু বোকা কুঁজবিহারীর জন্যে দুঃখ হল। তার ভবিষ্যৎ কোন্ পথে চলেছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। আহা বেচারা, জীবনে একটা সুযোগ পেয়েছে, কিছুদিন ভোগ করে নিক। কুঁজবিহারীর পরিচালনায় ছবি যে কেমন হবে তা তো বোঝাই যায়।

ক্রমে দু'চারটে গুজব কানে আসতে লাগল। কুঁজবিহারী ডিরেক্টর হয়েছে বটে কিন্তু আসলে সে সাক্ষীগোপাল; ফিনান্‌শিয়ারের ছেলেই সব কিছু করে। ছোঁড়া ভারি তুখোড়—নাম দীপচাঁদ। রোহিণী দেবীকে সে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে; তাদের ঘনিষ্ঠতা নাকি তোমাদের নীতিশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে গেছে।

সিনেমার ক্ষেত্রে এটা কিছু নতুন কথা নয়। চারিদিকে কাঁচাখেকো দেবতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নতুন মেয়ে দেখলে আর রক্ষে নেই। দীপচাঁদ যদি বা সাধু ব্যক্তি হত, অন্য কেউ না কেউ জুটে যেতই। তাছাড়া রোহিণীকে এক নজর দেখেই বুঝেছিলাম, চিরজীবন কুঁজহিারীর ঘর করবে এমন মেয়ে সে নয়। পাড়াগাঁয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে শহরের উঁচু ধাপে ওঠবার জন্য সে কুঁজবিহারীর সাহায্য নিয়েছিল, আবার কুঁজবিহারীর গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও উঁচু

ধাপে ওঠবার জন্যে সে স্বচ্ছন্দে অন্য লোকের সাহায্য নিতে পারে। বাঘিনী প্রথম মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে—

কুঁজবিহারী কিন্তু রোহিণীকে ভালবাসতো। কত ভালবাসতো তার পরিচয় একদিন পেলাম। তখনও রোহিণী আর দীপচাঁদের ব্যাপার কানাঘুষোর মধ্যেই আছে, ধোঁকার টাটি একেবারে ভেঙে পড়ে নি। সেদিন আমার কোনও কাজ ছিল না, ভাবলাম— যাই দেখে আসি কুঁজবিহারী কেমন শূটিং করছে। ষ্টুডিওর ভেতর ঢুকে দেখি, সেটের ওপর গজকচ্ছপের যুদ্ধ বেধে গেছে। প্রথমটা ভেবেছিলাম বুঝি কুস্তির দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে তারপর দেখলাম, না, সত্যিকার লড়াই চলছে। ষ্টুডিও সুদ্ধ লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

লড়িয়ে দু'জনের মধ্যে একজন আমাদের কুঁজবিহারী, অন্য লোকটাকে চিনি না। পরে জানতে পেরেছিলাম, একজন অভিনেতা। দু'জনে মরীয়া হয়ে লড়াই করছে; রক্তারক্তি কাণ্ড। যাহোক, আমি গিয়ে যুদ্ধ থামালাম, কুঁজবিহারীকে অতি কষ্টে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলাম।

'কী হয়েছিল?'

কুঁজবিহারী তখনও গজরাচ্ছে; বলল—'পাজি বজ্জাৎ সা.. আমার বৌয়ের নিন্দে করছিল—রোহিণী দেবীর নামে কুৎসিত অপবাদ দিচ্ছিল—'

বললাম—'ঠাণ্ডা হও। লোকের সঙ্গে মারপিট করলে বদনাম কমবে না, বাড়বে।'

সে হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—'কী অন্যায় দেখুন তো, যোশীজি। রোহিণী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ভাল মানুষ, এখনও সহবত শেখে নি; পুরুষদের সঙ্গে কি ভাবে মেলামেশা করতে হয় জান

জানে না, তাই একটু ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফ্যালে। তাই ব'লে তার নামে এতবড় মিথ্যে অপবাদ দেবে?'

বললাম—'ভারি অন্যায়। তুমি গায়ে মেখো না।'

সে বলল—'সত্যি বলছি আপনাকে, রোহিণী ভারি ভাল মেয়ে। কখনও আমি ওর বেচাল দেখি নি। তবু কেন বাইরের লোক ওর দুর্নাম দেবে? কেন বলবে যে দীপচাঁদের সঙ্গে ওর—'

কুঁজবিহারী আবার তেরিয়া হয়ে উঠল।

সেদিন কোনও রকমে তাকে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করলাম, কিন্তু ভবিতব্য যাবে কোথায়? কয়েকদিন পরে শুনলাম, দীপচাঁদ তাকে ছবির ডিরেক্টরের পদ থেকে বরখাস্ত করেছে, আর রোহিণীকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাসায় তুলেছে।

তারপর কতরকম গুজব কানে আসতে লাগল। কুঁজবিহারী নাকি জোর ক'রে দীপচাঁদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিল, দীপচাঁদের দারোয়ানেরা তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কুঁজবিহারী পুলিসে এত্তালা করেছে, এবার মোকদ্দমা করবে, ইত্যাদি। তারপর যা হয়ে থাকে—আস্তে আস্তে সব চাপাচুপি পড়ে গেল। কুঁজবিহারীর বৌ-চুরি এমন কিছু মহামারী ব্যাপার নয় যে তাই নিয়ে লোকে চিরকাল মশগুল থাকবে।

অনেকদিন পরে আবার কুঁজবিহারীর সঙ্গে দেখা হল। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা, চোখে আধ-পাগল চাউনি। সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম তার চুলে পাক ধরেছে।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'কী আর করবে কুঁজবিহারী, দুনিয়ায় এমন কত হয়। পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীজাতির চরিত্র—'

সে বলল—'রোহিণীর কোনও দোষ নেই। সে গাঁয়ের মেয়ে, তার কতটুকু বুদ্ধি? ঐ হতভাগা নচ্ছার দীপচাঁদ তাকে ভুলিয়ে—'

অন্ধকে চক্ষুদান করা আমার কাজ নয়; আমি সে-চেষ্টা করলাম না।

তারপর যথাসময়ে রোহিণীর ছবি বার হ'ল। এই ছবিই রোহিণী দেবীর একমাত্র কীর্তি, আর দ্বিতীয় ছবিতে নামবার অবকাশ তার হয় নি। বলাবাহুল্য ছবিটি বোম্বাইয়ে হপ্তাখানেক চলবার পর বন্ধ হয়ে গেল। বেশীদিন চলবার শক্তি তার ছিল না। তবে সিনেমা মহলে নবাগত রোহিণীর বেশ নাম হ'ল।

এরপর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। লোকে নানা কথা বলে; কেউ বলে দীপচাঁদ রোহিণীকে বিষ খাইয়েছিল, কেউ বলে রোহিণী আত্মহত্যা করেছিল। মোট কথা একদিন শোনা গেল রোহিণী মরেছে। উদীয়মানা অভিনেত্রীর অকাল মৃত্যুতে কাগজ-পত্রে একটু লেখালেখি হল।

ভাবলাম কুঁজবিহারীর দিক থেকে ঘটনাটা এমন কিছু মন্দ হল না; ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। রোহিণী যতদিন বেঁচে থাকতো কুঁজবিহারীর বুকের কাঁটা খচ্‌ খচ্‌ করত। এ বরং ভালই হ'ল।

মাস ছয় সাত পরে দাদর ষ্টেশনে কুঁজবিহারীর সঙ্গে দেখা হল। তেমনি উস্কখুস্ক ভাব, মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে। বললে, সিনেমা ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলেছে।

রোহিণীর কথা আর তুললাম না; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে লাভ কি? একথা সেকথার পর জিগ্যেস করলাম—

'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

সে বলল—'হ্যাঁ, একবার বোরিভ্‌লি যাচ্চি।

'হঠাৎ বোরিভ্‌লি? সেখানে কেউ আছে নাকি?'

কুঁজবিহারী একটু ইতস্তত করে বলল—'না, সিনেমা দেখতে যাচ্চি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে অপ্রস্তুত ভাবে বলল, —'রোহিণী দেবীর ছবিটা সেখানে দেখানো হচ্চে—বড় বড় সহরে তো ও ছবি আর দেখানো হয় না···রোহিণীকে অনেকদিন দেখি নি ···তার স্যাড্ সঙ্ শুনি নি—' বলতে বলতে কুঁজবিহারীর গলা বুজে এল।

এই সময় লোকাল ট্রেণ এসে দাঁড়ালো। কুঁজবিহারী একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল।

পাণ্ডুরঙের গল্প শেষ হইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিল—'কুঁজবিহারীকে পাগলের পার্টই দেওয়া যাক।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ও কিন্তু পারবে না।'

সোমনাথ বলিল—'কেন পারবে না? আমরা মেজে ঘষে ঠিক তৈরি করে নেব।'

পাণ্ডুরঙ্ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিরোইন

এক

অনেকগুলি নবীনা অভিনেত্রী সোমনাথকে ধরিয়াছিল। নব-বসন্তে যেমন প্রজাপতির ঝাঁক আসিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্যোৎসব সুরু করিয়া দেয়, গন্ধে বিহ্বল হইয়া কেবল উড়িয়া উড়িয়া ফুলকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি এই তরুণীগুলি সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া বসন্তোৎসবের সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অন্যায় করে নাই; কারণ আজ বসন্তোৎসব—হোলি। এই মেয়ে-গুলির দেহে যেমন যৌবনের মদশ্রী, মনেও তেমনি অফুরন্ত রঙ্গরস। সকলে সুন্দরী নয়, কিন্তু সকলেরই অন্তরে রসোল্লাসের মাদকতা তাহাদের কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহারা একজোট হইয়া, রঙ ও আবীরের হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া সোমনাথের অফিস আক্রমণ করিয়াছিল এবং সোমনাথকে একাকী পাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিয়াছিল। হাসির লহর, পিচকারির তরল বর্ণ-স্ফুরণ আবীর গুলালের চূর্ণোচ্ছ্বাস চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে রঙীন তরঙ্গ তুলিয়াছিল।

সোমনাথ এখন সিনেমা রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; সকলেই তাহাকে চেনে, সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করে। এই মেয়েগুলির সহিত কর্মসূত্রে সোমনাথের পরিচয় আছে; প্রত্যেকটি মনে মনে তাহার প্রতি প্রীতিমতী। তাই আজ হোলির সূত্র ধরিয়া তাহারা তাহার সর্বাঙ্গে প্রীতির ঝারি উজাড় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অন্যের প্রীতি নিজের মনেও প্রীতির সঞ্চার করে। মেয়েরা চলিয়া গেলে সোমনাথ ভিজা কাপড়চোপড় পরিয়াই বসিয়া রহিল এবং স্মিতমুখে তাহাদের কথা ভাবিতে লাগিল। ইহারা কেহ শ্যামলী কেহ গৌরী; কেহ প্রগল্‌ভা, কেহ বা ঈষৎ গর্বিতা। সোমনাথ শুধু ইহাদের চেনেই না, ইহাদের জীবনের গূঢ় কথাগুলিও তাহার জানা আছে। সিনেমা সমাজে কাহারও কোনও কথা গোপন থাকে না, সকলেই কাঁচের ঘরে বাস করে। ইহাদের জীবনে নিন্দার কথা অনেক আছে; কেহই নিষ্কলঙ্ক নয়, কেহই সতীসাধ্বী নয়। তবু—

ইহাদের নারীত্ব অবহেলার বস্তু নয়; সোমনাথ ইহাদের ঘৃণা করিতে পারে না। সত্য ইহারা নারীত্বের ব্যবসা করে কিন্তু পণ্য মাত্রেই কি হেয়? ফুলও তো বাজারে বিক্রয় হয়; ফুল কি হেয়?

সোমনাথের মনের চিত্রপটে মেয়েগুলি একটি একটি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের হাসি, চাহনি, দেহভঙ্গিমা—তাহাদের চমক-ঠমক—

সোমনাথ মনের মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল।

'কি দোস্ত, একেবারে তন্ময় হয়ে গেছ যে!'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। পাণ্ডুরঙ বাহির হইতে আসে নাই, অফিসেই ছিল। তরুণীপুঞ্জের আকস্মিক আক্রমণে সে আত্মরক্ষার্থে পাশের ঘরে লুকাইয়াছিল। তরুণীরাও সোমনাথকে পাইয়া আর কাহারও খোঁজ লয় নাই। এখন বিপদ কাটিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডুরঙ গুটি গুটি পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সোমনাথের সম্মুখে বসিয়া পাণ্ডুরঙ দুষ্টামিভরা হাসিল;—'যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধ্যানের পাত্রী বটে। তা—কোন্‌টির ধ্যান হচ্ছিল?'

সোমনাথ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—'আরে না না—

'পীরের কাছে মাম্‌দোবাজি চলে না, সে চেষ্টা কোরো না। আর এতে লজ্জারই বা আছে কি? এতদিনে যদি তোমার প্রাণে রঙ' ধ'রে থাকে—'

'কী পাগলের মতো বক্‌ছ।'

'ভাই সোমনাথ, তোমাকে আমার জীবনের ফিলজফি বলি শোনো। তোমাদের ঐ সঙ্কীর্ণ অনুদার যৌন-নীতি আমি মানি না। এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার আদর্শ; অর্জুন আমার আদর্শ। আরও অনেক বড় বড় আদর্শ আছে। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি; সে আমার গৃহদেবতা; কিন্তু তাই বলে আমি অন্য মেয়ের পানে চোখ তুলে চাইব না, এত অধম আমি নই। তুমি এতদিন নিজের পথে চলেছ, আমি কোনও দিন তোমাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি নি; কিন্তু আজ যদি তোমার ভিন্ন পথে চলবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমি বাধাও দেব না। এসব তুচ্ছ জিনিষ, এদের বড় ক'রে দেখতে নেই। আসল কথা হচ্ছে, দিল খাঁটি হওয়া চাই; ইমান দুরস্ত্ থাকা চাই। তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব। তোমার যদি কারুর ওপর মন পড়ে থাকে তাতে লজ্জার কিছু নেই। ওটা বয়সের ধর্ম, প্রকৃতির লীলা—'

'চুপ কর পাণ্ডুরঙ্, ওসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

'তুমি মনকে চোখ ঠাউরেছ সোমনাথ। একদিন ঘাড় মুচড়ে পড়বেই, তার চেয়ে চোখ খুলে পড়া ভাল। ঐ যে মেয়েগুলো আজ এসেছিল ওদের প্রত্যেকের মনের কথা আমি জানি। তোমার জন্যে ওরা পাগল। ওরা যখন পরের বাহুতে বাঁধা থাকে তখনও ওরা তোমার কথা ভাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওরা তোমার স্বপ্ন দেখে—'

'ছি পাণ্ডুরঙ্'—সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল—'তুমি আমাকে লোভ

'আলে'

কেব' চেষ্টা করছ।'

ইন্দু নিশ্বাস ফেলিল।

না, দেখাই নি ভাই, অদৃষ্টের কথা ভাবছি। কেউ চেয়ে পায় না, কেউ পেয়েও চায় না—এই দুনিয়া; কিন্তু যৌবনকে বঞ্চনা কর' খেরে ভাল হয় না সোমনাথ; অন্তরের ভুখা. ভগবান একদিন প্রতি' নবে—'

সোমনাথ আর দাঁড়াইল না, 'ড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় পাণ্ডুরঙ্কে গম্ভীর কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া গেল—'তুমি একটা নরকের কীট।'

কিন্তু মুখে যত ভর্ৎসনাই করুক মনের কাছে লুকোচুরি চলে না। সোমনাথ মনে মনে এই মেয়েগুলির রূপযৌবনের চিন্তা করিতেছিল ইহা সে নিজে কি করিয়া অস্বীকার করিবে? নিজের কাছে ধরা পাড়িয়া গিয়া তাহার অন্তরাত্মা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছি ছি ছি। সে এ কি করিতেছে। তাহার মন তাহার একান্ত অজ্ঞাতসারে এ কোন্ আঁস্তাকুড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাহার মন তো এমন ছিল না। তিন বছর আগে যখন সে এই সিনেমা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার মন দৃঢ় ছিল, নির্ম্মল ছিল; পরস্ত্রীর প্রতি লুব্ধতা তাহার ছিল না। মন লইয়া সে গর্ব করিতে পারিত; কিন্তু আজ এ কি হইয়াছে! কোন্ শিথিলতার ছিদ্রপথে এই দৌর্বল্য তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে? সব চেয়ে আশ্চর্য, তাহার মনে যে এমন ঘুণ ধরিয়াছে তাহা সে নিজেই এতদিন জানিতে পারে নাই।

লম্পট! কথাটা মনে আসিতেই তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। লোকে তাহাকে আড়ালে লম্পট বলিবে, প্রকাশ্যে

চোখ টিপিয়া হাসিবে। ভদ্রলোক ... সামলাইবে। আর রত্না—সে কি ভাবিবে ... আর

বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ ভিজা কাপড়-চোপড় ... গেল। অশান্ত বিবেক-পীড়িত মন, অথচ বাড়িতে কথা ... একটি লোক নাই ; দিদি জামাইবাবু এখনও পুনায় আছে। স্নান করিতে করিতে তাহার ইন্দুবাবুর কথা মনে প... ইন্দুবাবু একদিন তাহাকে ললিত ও লতার ক... শুনাইয়াছিলেন। ললিতও ভাল ছেলে ছিল—

বৈকাল বেলা সোমনাথ ...বার মোটর লইয়া বাহির হইল ; ইন্দুবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দুবাবু তক্তপোষের উপর পদ্মাসনে বসিয়া একটি লম্বা-চওড়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সোমনাথকে দেখিয়া বই সরাইয়া রাখিলেন।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'কি বই পড়ছেন ?'

ইন্দুবাবু একটু অপ্রতিভবাবে হাসিয়া বলিলেন—'গীতা। একটা নতুন এডিশন বেরিয়েছে—বেশ ভাল। তাই নেড়ে-চেড়ে দেখছিলাম।' বইখানা আবার টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিতে লাগিলেন—'বঙ্কিম চার অধ্যায়ের বেশী টীকা লিখে যেতে পারেন নি, বাঙ্গলাভাষার দুর্ভাগ্য। যদি শেষ করতে পারতেন, অমর গ্রন্থ হত।'

গীতা সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও জ্ঞানই ছিল না। গীতা ভগবদ্‌ বাক্য, যাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য ; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র দর্শন পড়ে তাহারা পাশ্চাত্য দর্শন মুখস্থ করে কিন্তু ষড়্‌দর্শনের খোঁজ রাখে না। সোমনাথেরও মনের ও-দিকটা অন্ধকারই ছিল। ইন্দুবাবু কথাপ্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যে

আলোচনা করিতে লাগিলেন সে তাহা বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল নীরবে শুনিয়া গেল।

ইন্দুবাবু এক সময় বলিলেন—'আমাদের দর্শনশাস্ত্র পড়বার সময় একটা বড় অসুবিধা হয়—পরিভাষা নিয়ে। কখন কোন পারিভাষিক শব্দ কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা বোঝা শক্ত। টীকাকারেরাও সবাই নিজের কোলে ঝোল টেনেছেন, নানা মুনির নানা মত। এই দ্যাখো না, গীতায় এক যায়গায় বলা হয়েছে—'বিষয় বস্তুর ধ্যান করতে করতে পুরুষের সেই বিষয় আসক্তি জন্মায়; আসক্তি থেকে কাম জন্মায়; কাম থেকে ক্রোধ; ক্রোধ সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম; স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের ফলে মানুষ বিনাশ পায়।' এই শ্লোকগুলিতে সব কথারই মানে বোঝা যায়, কেবল স্মৃতিবিভ্রম ছাড়া। এই স্মৃতিবিভ্রম বলতে ঠিক কি বোঝায় তুমি বলতে পার?'

সোমনাথ বলিল—'স্মৃতিবিভ্রম কথার সাধারণ মানে তো—'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'সাধারণ মানে এখানে চলবে না, এটা পারিভাষিক শব্দ। আমার কি মনে হয় জানো? ইংরাজিতে যাকে sence of values বলে সেই মূল্যবোধ হারানোর নামই স্মৃতিবিভ্রম। মানুষ যখন এই জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে তখন তাকে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য। তোমার কি মনে হয়?'

সোমনাথ উঠিয়া পড়িল—'আমি এসব কিছু বুঝি না। আচ্ছা, আর একদিন আসব। আপনি শাস্ত্রচর্চা করুন।' বলিয়া সে বিদায় লইল।

আজ সোমনাথ ইন্দুবাবুর কাছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই; তাহার অস্থির মন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল ইন্দুবাবুর সঙ্গে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলিলেই

তাহার মনটা সুস্থ হইবে; কিন্তু ইন্দুবাবুকে গীতায় মশ্‌গুল দেখিয়া সে নিরাশ হইল। তাহার মনের যে অবস্থা তাহাতে এই জাতীয় সূক্ষ্ম আলোচনা তাহার অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। সোমনাথের মনে কোন অজ্ঞান ধর্মবোধ ছিল না, এ বয়সে তাহা থাকে না। যাহা ছিল তাহা রক্তগত শুচিতার সংস্কার। এই সংস্কারই তাহাকে অনেক বিপদে আপদে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিলে জন্মগত সংস্কারও পঙ্গু হইয়া পড়ে—মূল্যবোধ বিকৃত হয়। সোমনাথ যদি মন দিয়া গীতাবাক্য শুনিত তাহা হইলে হয়তো তাহার বর্তমান সঙ্কটও অনেকটা সরল হইয়া যাইত; কিন্তু সে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় নিয়তির দ্বারা চালিত হইতেছিল। তাহার ভাগ্যদেবী তাহাকে লইয়া আবার নূতন খেলা খেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন।

মোটরে লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে আবার ষ্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টুডিওতে আজ ছুটি; কাজকর্ম কিছু নাই। তবু এই ষ্টুডিও তাহার মনের চারিপাশে এমন শিকড় বিস্তার করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে যে কাজে অকাজে এ স্থানটি ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। হানা বাড়ির মতো ইহার একট অনিবার্য মোহ আছে।

কিন্তু ষ্টুডিওতে পৌঁছিয়াই একটা সংবাদ বোমাবিস্ফোরণের মতো তাহাকে প্রায় মূর্ছাহত করিয়া দিল। শম্ভুলিঙ্গ মহাশয় হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিলেন—'সোমনাথবাবু, আমার কি হবে? রুস্তমজি মারা গেছেন।'

'কী?'

'হাঁ—এই ঘণ্টাখানেক হল। আজ হোলি; বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব মদ খেয়েছিলেন, হঠাৎ হার্ট ফেল করে গেছে।'

সোমনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

রুস্তমজির মৃত্যু যেন চোখে আঙুল দিয়া সোমনাথকে পথ দেখাইয়া দিল।

তারপর একহপ্তা কাটিয়াছে। রুস্তমজি উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাই ইতিমধ্যেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মামলা সুরু হইয়া গিয়াছে। ষ্টুডিও আদালতের হেফাজতে রাখিবার কথা হইতেছে।

সোমনাথ অন্য অনেক চিত্র-প্রণেতার নিকট হইতে সাদর আমন্ত্রণ পাইতেছে; সকলেই তাহার হাতে চিত্র রচনার ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে প্রস্তুত; সোমনাথ এই সাতদিন নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছক কাটিয়া যাত্রাপথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে; কোনও প্রলোভনই আর তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

এই কয় বৎসরে সে যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা তাহার সঞ্চয় হইয়াছে। একটা মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়? উপরন্তু তাহার কর্মজীবন এখনই তো শেষ হইয়া যাইতেছে না।

জামাইবাবুকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সে ডাকে দিল। তারপর বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে বিদায় লইল। পাণ্ডুরঙ্‌কে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—'কলকাতায় চললাম। আমার মোটরটা তুমি ব্যবহার কোরো।'

পাণ্ডুরঙ্‌ ভারী গলায় বলিল—'তুমি যেখানেই যাও, আমার ভালবাসা তোমার সঙ্গে থাকবে।'

দুই

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোমনাথ হ্যারিসন রোডের একটি ভাল হোটেলে উঠিল। তাহার চেহারা দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু সোমনাথ আত্মপরিচয় দিয়া একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিতে রাজী নয়। বিখ্যাত অভিনেতা সোমনাথ চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়াছে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, তাহার আর প্রাণে শান্তি থাকিবে না, সময়ে অসময়ে লোক দেখা করিতে আসিবে; কাগজে লেখালেখি হইবে। সে হোটেলের খাতায় ছদ্মনাম লিখাইল।

তারপর তাহার কাজ আরম্ভ হইল। বসিয়া থাকার কাজ নয়; অনেক ছুটাছুটির কাজ। উকিলের সহিত পরামর্শ, সরকারী দপ্তরে ঘাঁটাঘাঁটি, বড় বড় বিলাতী সওদাগরী অফিসে যাতায়াত, কলকব্জা খরিদ। তিন চার বার তাহাকে কলিকাতার বাহিরেও যাইতে হইল।

এইভাবে মাস দেড়েক কাটিল। তারপর একদিন হোটেলের সম্মুখেই একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল।

'সোমনাথ! তুমি হেথায়?'

ইনি সেই শিক্ষক-বন্ধু, যিনি সোমনাথের প্রথম ছবি বাহির হইবার পর প্রশস্তি জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গান্তরে মিষ্টান্ন দাবী করিয়াছিলেন। ইনি জামাইবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সোমনাথ বন্ধুকে হোটেলে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ; দুই বন্ধুতে অনেক মনের প্রাণের কথা হইল; কিন্তু সোমনাথ নিজের বর্তমান বৈষয়িক ভাবান্তরের কথা কিছু

ভাঙিল না।

বন্ধু এক সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—'হঠাৎ এ সময় এলে যে! রত্নাকে দেখতে?'

'রত্নাকে দেখতে! কেন, কি হয়েছে রত্নার?'

'সে কি, তুমি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম—'

'না, আমি কিছু জানি না।'

বন্ধু বিস্মিত হইলেন; 'রত্না প্রায় এক বছর হল ভুগছে।'

'কি হয়েছে?'

'সত্যি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম রত্না আর তোমার মধ্যে একটা বোঝাপড়া—'

'না, তুমি ভুল বুঝেছ। রত্নার সঙ্গে আমার কোনও বোঝাপড়া নেই। সে মাঝে বার দুই বোম্বাই গিয়েছিল, দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত।—কিন্তু তার অসুখটা কী।'

বন্ধু সাবধানে বলিলেন—'তা ভাই আমি ঠিক জানি না। তবে শরীর সুস্থ নয়। তুমি তো জানো আমি ওদের দূরস্থ আত্মীয়, বেশী মেলামেশা নেই। শুনেছি রত্নাকে মধুপুর না গিরিডিতে নিয়ে গিয়ে রাখবার কথা হয়েছিল; কিন্তু রত্না রাজি হয় নি।—তোমার বোধহয় দেখা করা উচিত।'

বন্ধু চলিয়া যাইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই যে বছর দেড়েক আগে একটি ঝড়ের রাত্রে রত্না তাহার বাসায় রাত কাটাইয়াছিল, তারপর হইতে রত্নার কোনও খবরই সে রাখে না। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই; বিবাহ হইলে সোমনাথ নিশ্চয় খবর পাইত। হয়তো অসুখের জন্যই বিবাহ হয় নাই; নচেৎ বিবাহ না হইবার অন্য কোনও কারণ নাই।

অসুখটা কী? বন্ধু যেন গুরুতর অসুখের ইসারা দিয়া গেলেন। তাহাকে দেখিতে যাওয়া কি সোমনাথের উচিত হইবে? রত্না সোমনাথের উপর বিরক্ত; হয় তো দেখা করিতে গেলে আরও উত্ত্যক্ত হইবে—

তবু সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সোমনাথ রত্নাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

জামাইবাবুর দাদা কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। বালীগঞ্জে তাঁহার সুদৃশ্য দ্বিতল উদ্যানমধ্যবর্তী বাড়িটি তাঁহার শ্রীসমৃদ্ধির সাক্ষী।

গৃহস্বামী বাড়ি ছিলেন না; দিদির জা মনোরমা দেবী সমাদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন। তিনি স্থূলকায়া ও বহুভাষিণী; নচেৎ লোক ভাল।

'এস ভাই। অনেক দিন তোমায় দেখি নি; অবিশ্যি ছবিতে অনেকবার দেখেছি। কী সুন্দর ছবিই করেছ! কে ভেবেছিল তোমার পেটে এত আছে! তা—কবে এলে?'

সোমনাথ ভাসা-ভাসা উত্তর দিল। দু'চার কথার পর সে জিজ্ঞাসা করিল—'রত্না কেমন আছে?'

মনোরমা দেবী বলিলেন—'রত্নার শরীর ভাল যাচ্ছে না ভাই। সেই যে ও-বছর বর্ষার সময় বোম্বাই গিছল, সেখান থেকে ফিরে ওর শরীর খারাপ যাচ্ছে। তোমাদের বোম্বাই ভাল যায়গা নয়, যাই বল। কী রোগ যে নিয়ে এল, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে মেয়েটা। অথচ বাড়িতেই ডাক্তার; ওষধ-বিষুধ সবই খাওয়ানো হচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই ওর শরীর সারছে না।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'রোগটা কি?'

মনোরমা গলা খাটো করিয়া বলিলেন—'উনি তো প্রথমে সন্দেহ

করেছিলেন বুঝি টিবি ; কিন্তু এক্স্রে করে কিছু পাওয়া যায় নি। ভগবানের দয়া। তবু খুব সাবধানে রেখেছি, বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ—বেশী চলাফেরা বারণ—'

'এখন সে বাড়িতে আছে তো ?'

'ওমা, বাড়িতে আছে বৈকি! ওপরে আছে—ওর দাদা বেশী ওপর নীচে করা মানা করে দিয়েছেন। তা ওকি শোনে ? মাঝে মাঝে নেমে আসে। তুমি এসেছ সাড়া পেলে হয়তো এখনি নেমে আসবে। তা তুমি ওপরেই যাও না ভাই। তুমি তো বাড়ির ছেলে। এখন না হয় মস্ত লোক হয়েছ, কাক-কোকিলে নাম জানে। যাও, ওপরে যাও, আমি তোমার চা জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দ্বিতলে গিয়া সোমনাথ একটি বন্ধ দরজায় টোকা দিল। ভিতর হইতে রত্নার গলা আসিল—'কে ? ভেতরে এস।'

সোমনাথ দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েলি ছাঁদে সাজানো পরিপাটি কক্ষ। এটি রত্নার নিজস্ব ঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার সম্মুখে বসিয়া সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় রত্না একখানা বই পড়িতেছিল। সোমনাথকে দেখিয়া সে সম্মোহিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। তাহার শীর্ণ মুখ হইতে রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা যেন আরও পাংশু দেখাইল।

সোমনাথ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আমাকে কি চিনতে পারছ না ?'

'না, পারছি না। এস—বোসো।' কথাগুলি ব্যঙ্গোক্তি হই[illegible]খাস রত্নার স্বর এত ক্ষীণ ও দুর্বল শুনাইল যে সোমনাথের বুকে সূক্ষ্ম শলাকার মতো বিঁধিল।

দু'জনে একটি সোফায় বসিল। রত্না আরও কিছুক্ষণ সোম[illegible]মনাথ [illegible]—'

পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'কি ভাগ্যি যে এলে! একেবারে ভুলে যাও নি তাহলে?'

সোমনাথ একথার উত্তর অনেক ভাবে দিতে পারিত, কিন্তু সে আবেগভরে বলিয়া উঠিল—'তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ রত্না!'

রত্না হাসিল। তাহার শীর্ণ মুখে হাসি ভাল মানাইল না। কপাল হইতে একগুচ্ছ রুক্ষ চুল সরাইয়া সে বলিল—'ও কিছু নয়। তুমি কেমন আছ বল। হঠাৎ এ সময়ে কলকাতায় এলে যে! কাজকর্ম কি বন্ধ?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'

রত্না উচ্চকিত ভাবে চাহিল।

'সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ? ও—এবার কলক তায় বাংলা ছবি করবে!'

সোমনাথ মাথা নাড়িল।

'না। সিনেমা করাই ছেড়ে দিয়েছি।'

রত্না নিশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই সময় একটি দাসী সোমনাথের জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। ঘরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছিল, রত্না উঠিয়া সুই টিপিয়া আলো জ্বালিল। বলিল—'ঝি, আমার জন্যেও এক য়ালা চা নিয়ে এস।'

যাই বলিল—'তোমার যে এখন ডাক্তারী দুধ খাবার সময় দিদিমণি।'

মেয়েটা বিরক্ত হইয়া বলিল—'না; চা নিয়ে এস।'

হচ্ছে; িয়া গেল।

সোমনাথ াবার গিয়া বসিল। সোমনাথ লক্ষ্য করিল রত্নার গালে মনোরমা ক্ত সঞ্চার হইয়াছে, চক্ষু দুটিও যেন চাপা উত্তেজনায় উজ্জ্বল

দেখাইতেছে। সে জলখাবারের রেকাবি টানিয়া আহারে মন দিল।

রত্না বলিল—'এর মানে? সিনেমায় তো বেশ টাকা পাচ্ছিলে।'

সোমনাথ বলিল—'ছেড়ে দেবার ওটাও একটা কারণ। এই তিন বছরে যা পেয়েছি তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রত্না বলিল—'সিনেমায় এত শিগগির তোমার অরুচি ধ'রে যাবে তা ভাবি নি। ও পথে যে যায় তাকে বড় একটা ফিরতে দেখা যায় না। তোমার এই বৈরাগ্যের অন্য কোনও কারণ আছে নাকি?'

সোমনাথ শান্তভাবে বলিল—'আছে। রুস্তমজি মারা গেলেন, সেটাও একটা কারণ। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

ঝি আসিয়া রত্নাকে চা দিয়া গেল। সোমনাথ নিজের চায়ের বাটি তুলিয়া লইয়া একটু হাসিল।

'আর একদিনের চা খাওয়ার কথা মনে পড়ে? বাইরে ঝড়ের মাতন, সমুদ্রের আফসানি, তার মধ্যে টর্চের আলো জ্বেলে চা তৈরি করে খাওয়া?'

রত্নার মুখখানা ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন একরকম হইয়া গেল; তারপর সামলাইয়া লইল। বলিল—'আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ যে! বল না—তা ছাড়া কী?'

সোমনাথ ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—'কি হবে ব'লে? তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'তবু বলই না শুনি।'

নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সোমনাথ বলিল—'ইদানীং ভয় হয়েছিল বুঝি তোমার কথাই ফলে যায়—'

'আমার কথা ?'

'হ্যাঁ। তুমি দিদিকে একবার লিখেছিলে, আমি যখন সিনেমায় ঢুকেছি তখন আমার পতন অনিবার্য। ইদানীং আমারও সেই ভয় হয়েছিল। তাই—পালিয়ে এলাম।'

রত্নার পানে সসঙ্কোচে চোখ তুলিয়া সোমনাথ দেখিল, রত্নার করতলে চায়ের পেয়ালা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনি পড়িয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি পেয়ালা লইয়া সরাইয়া রাখিল। রত্নার মুখ আবার পাণ্ডাস বর্ণ ধারণ করিয়াছে—ঠোঁট দুটি অসম্ভব রকম কাঁপিতেছে।

'কি হল রত্না ?'

রত্না প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিল।

'কিছু না। আমার শরীরটা একটু—। মাঝে মাঝে অমন হয়। তুমি আজ এস গিয়ে।'

সোমনাথ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিক উত্তেজনা দুর্বল শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সে বলিল—'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বড়দিদিকে পাঠিয়ে দেব ?'

'না না, তার দরকার নেই। আমি আপনিই ঠিক হয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

সোমনাথ দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, পিছন হইতে রত্না ডাকিল—'শোনো।'

সোমনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'আবার আসবে তো ?'

'আসব ; কিন্তু—'

'কবে আসবে ?'

সোমনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'কাল আমাকে বাইরে যেতে

হবে। হপ্তাখানেক পরে ফিরব। তারপর আসব।'

সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

তিন

কলিকাতায় আসিয়া সোমনাথ একটি মোটর-লঞ্চ কিনিয়াছিল। পরদিন সকালবেলা সে কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া লঞ্চে উঠিল; ভাগীরথীর আঁকা-বাঁকা পথে নৌকা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

এক হপ্তার মধ্যে ফিরিবার কথা, কিন্তু ফিরিতে সোমনাথের এগারো দিন লাগিল। যা হোক, কাজকর্ম সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়াই সোমনাথ রত্নাদের বাড়ি গেল। আজ রত্নার দাদা বাড়িতে ছিলেন। বয়স্থ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, জামাইবাবুর মতো রঙ্গ-রসিকতা বেশী করেন না; কিন্তু ভিতরে রস আছে; বর্ণচোরা আম।

দেবেশবাবু বলিলেন—'সেদিন এসেছিলে, দেখা হয় নি। এস তোমার সঙ্গে গল্প করি।' বলিয়া নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

দুজনে উপবিষ্ট হইলে দেবেশবাবু বলিলেন—'শুনলাম তুমি সিনেমা ছেড়ে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'টাকা তো বেশ পাচ্ছিলে; নামও যথেষ্ট হয়েছে। তবে ছেড়ে দিলে যে। আর কি ভাল লাগল না?'

'আজ্ঞে না। সময় থাকতে ছাড়াই ভাল।'

দেবেশবাবু একটু হাসিলেন—'বেশ বেশ। কোনও জিনিষেই মোহ

থাকা ভাল নয়।'

সোমনাথ নীরব রহিল। দেবেশবাবু তখন বলিলেন—'রত্না অনেক দিন ধরে ভুগছে। ও আমাদের বড় আদরের বোন; ভারি ভয় হয়েছিল। রোগটা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। এখন মনে হয় ধরেছি।'

সোমনাথ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। দেবেশবাবু উঠিয়া পায়চারি করিতে [illegible], তারপর বলিলেন—'দেহের রোগ নয় মনের রোগ। সেদিন তুমি তাকে দেখে গিয়েছিলে তো, আজ আবার দেখলেই বুঝতে পারবে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পরই তার রোগের সূত্রপাত হয়। মনের মধ্যে অনেকগুলো জট পাকিয়েছিল। যাহোক, এখন বোধহয় সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।'

সোমনাথ নিরুত্তর রহিল। দেবেশবাবু আবার আসিয়া বসিলেন; বলিলেন—'সোমনাথ, তুমি যদি রত্নাকে বিয়ে করতে চাও, আমাদের কোনও আপত্তিই হবে না; বরং আমরা খুব খুশী হব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—'আপনি বোধহয় জানেন না, আগে একবার এ প্রস্তাব হয়েছিল; কিন্তু রত্না—'

দেবেশবাবু বলিলেন—'রত্না বড় অভিমানী মেয়ে। সে সময় হয়তো ওর মনে ক্ষোভের কোনও কারণ হয়েছিল। যা হোক, সে সব কেটে গেছে।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'ওর স্বভাব যে জিনিষ ও মনে মনে চায় প্রাণ গেলেও তা মুখ ফুটে চাইবে না। আমি জানতে পেরেছি, তোমাকেই ও বিয়ে করতে চায়। এখন তোমার হাত।'

সোমনাথ আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেবেশবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, যাও। রত্না ওপরেই আছে। মনে রেখো, রোগীকে অনেক সময় জোর করে ওষুধ খাওয়াতে হয়।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সোমনাথ উপরে গেল।

রত্নাকে দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল। এই কয় দিনে তাহার কী অপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে! শীতের শেষে পাতা ঝরিয়া লতা শুষ্ক শীর্ণ আকার ধারণ করে, আবার নব-কিশলয়ে তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া যায়। রত্নার মুখের সেই দৃঢ় অথচ সুকুমার ডৌল ফিরিয়া আসিয়াছে; গাল দুটিতে নব পল্লবের কোমল অরুণিমা।

রত্না নত হইয়া সোমনাথের পদধূলি লইল; একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—'সেদিন তোমাকে পেন্নাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

সোমনাথের হৃদ্‌যন্ত্র দুন্দুভির মতো শব্দ করিতেছে; প্রথম যেদিন সে ক্যামেরা ও মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল সেদিনও এত ভয় হয় নাই; কিন্তু সে সংযতভাবে একটি গদি মোড়া চেয়ারে গিয়া বসিল; গম্ভীর মুখে বলিল—'ভুল সকলেই করে; কিন্তু সময়ে শুধরে নেওয়া চাই।'

রত্না তাহার প্রতি একটি চকিত দৃষ্টিপাত করিল; পরে সোফার এক কোণে বসিয়া বলিল—'এই বুঝি তোমার এক হপ্তা পরে আসা? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

সোমনাথ বলিল—'সোঁদরবনে।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

'সে কি! শিকারে গিয়েছিলে?'

'উহুঁ।'

'তবে?'

সোমনাথের স্নায়ুমণ্ডলী এতক্ষণে কিছু ধাতস্থ হইয়াছে, হৃদ্‌যন্ত্রও

বেশী গণ্ডগোল করিতেছে না। সে উঠিয়া গিয়া সোফায় রত্নার পাশে বসিল।

'রত্না, তোমাকে একটা খবর দিই। আমি সুন্দরবনে পাঁচশো বিঘে জমি কিনেছি। খুব ভাল ধান জমি। আর কী সুন্দর যায়গা! চারদিকে নদী আর জঙ্গল। কলকাতা থেকে জলপথে চার ঘণ্টার রাস্তা। এবার সেইখানে বসে চাষবাস করব।'

রত্না যেন বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চাহিয়া রহিল; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—'চাষবাস করবে? কিন্তু—চাষবাসের তুমি কী জানো?'

'কিছু জানি না। যখন সিনেমা করতে গিয়েছিলাম তখন সিনেমার কিছুই জানতাম না। শিখেছি। এও শিখব। আমি ট্র্যাক্‌টর কিনেছি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করব। একটা মোটর-লঞ্চ্‌ কিনেছি, যখন ইচ্ছে হবে কলকাতায় চলে আসব।'

'কিন্তু চাষবাস কেন? অন্য কোনও কাজ কি করতে পারতে না?'

'আমি সৃষ্টি-ধর্মী কাজ করতে চাই। যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা অনেক বড় বড় সৃষ্টি করেন, তাঁদের সৃষ্টি দেশের সম্পদ। আমার প্রতিভা নেই, কিন্তু শস্য উৎপাদন তো করতে পারব। আমার পাঁচশো বিঘা জমিতে বছরে অন্তত পাঁচ হাজার মণ ধান হবে। সব ধান আমি একলা খেতে পারব না, বেশীর ভাগই দেশের লোকের পেটে যাবে। দেশের অন্ন-সম্পদ বাড়বে। সেটাই কি কম কথা?'

রত্না অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ দেখিল তাহার মুখে শ্বেতাভা ও রক্তাভা পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে। সে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'আমি যা করতে যাচ্ছি তা কি তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসিল; বলিল—'খুব ভাল লাগছে—'

উৎসাহিত হইয়া সোমনাথ বলিল—'আমি সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি করাচ্ছি রত্না। মাত্র দুটি ঘর; তাদের ঘিরে বারান্দা। আর বাড়ি ঘিরে বাগান। কেমন, সুন্দর হবে না?'

তা হবে; কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

রত্না নিজের চুড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—'তুমি সারা জীবন শহরে কাটিয়েছ, গত তিন বছর হাজার লোকের মধ্যে কাজ করেছ। দেশজোড়া তোমার সুখ্যাতি। এখন সব ছেড়ে দিয়ে ঐ বনে কি তোমার মন লাগবে?'

সোমনাথ রত্নার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'লাগবে যদি একটি মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে।'

রত্না সোমনাথের মুঠি হইতে নিজের হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সোমনাথ হাত ছাড়িল না। তখন রত্না ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সোমনাথ বলিল—'কান্নাকাটি কিছু শুনব না। আমাকে বিয়ে করতে হবে; ঐ জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে। যদি রাজি না হও জোর করে ধরে নিয়ে যাব। তোমার দাদা কিছুই বলবেন না।'

রত্না বাঁ হাতে চোখ মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভাঙা গলায় বলিল—'তুমি জানো না, আমার টিবি হয়েছে। দাদা মুখে বলেন না, কিন্তু আমি জানি।'

সোমনাথ তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'তুমি কিচ্ছু জানো না। তোমার যা হয়েছে তা দাদা আমাকে বলেছেন। দেহের রোগ নয়, মনের রোগ। মনে মনে প্রেম,

আর মুখে ঝগড়া করলে ঐ রোগ হয়। বুঝলে ?—যাহোক, ঠিক সময়ে ওষুধ পড়েছে, এবার আর রোগ থাকবে না। ওষুধ যে ধরেছে তার লক্ষণও এরি মধ্যে দেখা যাচ্ছে—' বলিয়া তাহার গালে আঙুলের মৃদু টোকা দিল।

মেয়েরা সময় বিশেষে কাঁদিয়া বড় আনন্দ পায়। রত্না প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল—'কাল সকালেই দিদিকে 'তার' করতে হবে। দিদি আর জামাইবাবু যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ কিছুই হবে না।'

চার

ফুলশয্যার রাত্রে ঘর অন্ধকার করিয়া দু'জনে শুইয়াছিল। মধ্যরাত্রির পড় বাড়ি নিস্তব্ধ হইয়াছে; ফুলের গন্ধে রুদ্ধশ্বাস বাতাস নিঃশব্দ সঞ্চারে জানালা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। আকাশের খণ্ডচন্দ্র অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে।

অন্ধকারে রত্নার একটা হাত সোমনাথের বুকে আসিয়া পড়িল। রত্না মৃদুস্বরে বলিল—'তুমি আমাকে বড্ড জ্বালিয়েছ।'

সোমনাথ তাহার হাত মুঠিতে লইয়া বলিল—'আমি জ্বালিয়েছি; তা তো বটেই।—আচ্ছা রত্না, কবে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল, মানে, কবে তুমি আমাকে ভালবাসলে ঠিক করে বল তো।'

'দশ বছর বয়সে।'

উঃ কী পাকা মেয়ে!'

'মেজদার বিয়ের ফুলশয্যার দিন তোমাকে প্রথম দেখি, তুমি বৌদির সঙ্গে এসেছিলে। সেই দিনই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম,

তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।'

'প্রথম দর্শনেই এত! তারপর।'

'তারপর আট বছর অপেক্ষা করলাম। ঠিক করেছিলাম আই এ পর্যন্ত পড়ব তারপর বিয়ে। যখন বিয়ের সময় হল তখন দেখি তুমি সিনেমায় ঢুকে পড়েছ।'

'তাতেই বুঝি মেজাজ বিগড়ে গেল?'

'বোম্বাই এলাম নিজের চোখে দেখতে। যা দেখলাম তাতে মন আরও বিষিয়ে গেল। তারপর এই তিন বছর যে আমার কি করে কেটেছে তা আমিই জানি।'

সোমনাথ বলিল—'আমার ওপর যদি তোমার মন বিষিয়েই গিয়েছিল তবে লুকিয়ে আমার ছবি দেখতে কেন?'

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। ছবিতে তোমাকে দেখতাম আর ভাবতাম—তুমি কি ভাল আছ? নষ্ট হয়ে যাও নি? —সেবার সেই ঝড়ের রাত্রে গিয়ে পৌঁছুলাম; সে রাতটা ভুলব না—'

সোমনাথ বলিল—'আমিও না।'

রত্না বলিতে লাগিল—'সে রাত্রে যদি তুমি আমাকে চাইতে আমি বোধহয় না বলতে পারতাম না; কিন্তু তুমি ও দিক দিয়ে গেলে না। আমি কি করব? আমি কি বলব, ওগো তুমি আমায় বিয়ে কর?'

'তাহলে সে রাত্রে আর তোমার সন্দেহ ছিল না?'

'সন্দেহ যায় নি; কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম ভাল হও মন্দ হও তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

সোমনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল।

'এখন সন্দেহ গেছে তো?'

রত্না তাহার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সোমনাথ বলিল—'রত্না, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়েই যেতাম, যদি তুমি আমার মনের মধ্যে না থাকতে। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

তারপর দীর্ঘকাল আর কোনও কথা হইল না। স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে চোখ বুজিয়া রত্না ভাবিতে লাগিল, পূর্ব জন্মে কোন্ পুণ্য করিলে মানুষ এত সুখ অনুভব করে?

একটি মোটর লঞ্চ নদীর রবিকরোজ্জল বুক চিরিয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়াছে। নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে; যেন উড়িয়া চলিয়াছে।

দুই তীরের নগর পিছনে পড়িয়া রহিল; গ্রামগুলি কিছু দূর আসিয়া থামিয়া গেল। কেবল রহিল উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ আর নীচে সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমি।

নদী ক্রমে সপ্তমুখী হইল; আঁকিয়া বাঁকিয়া শাখা বিস্তার করিয়া গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করিল। ক্ষিপ্রবেগা তরণী তাহারই পাকে পাকে পথ চিনিয়া চলিয়াছে; যেন বন-কপোত নিজ নীড়ের সন্ধানে উড়িয়া যাইতেছে। অতি নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র একটি নীড়, সেই নীড়ে সে ফিরিবে—তাহাতে কেবল দুইটি পাখীর স্থান—

চারিদিকে আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। কোথাও আলো বেশী, ছায়া কম; কোথাও আলো কম ছায়া বেশী। আলোতে ছায়াতে মিলিয়া বিচিত্র চঞ্চল ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে।

অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিরো

এক

স্ত্রী হোন বা পুরুষ হোন, তাঁহার যদি রূপ থাকে তবে তিনি মনে মনে সে বিষয়ে সচেতন থাকিবেন এবং গর্ব অনুভব করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আমি কয়েকজন রূপবান পুরুষকে জানি, তাঁহারা আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশ একটু অনুগ্রহ-পূর্বক কথা বলিয়া থাকেন। আর মেয়েদের তো কথাই নাই, তাঁহারা সর্বদা নিজেদের চেহারার সামনে অদৃশ্য আয়না ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং ঘুরিয়া তাহাই দেখিতেছেন।

কদাচিৎ এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিপর্যয় দেখা যায়। সোমনাথ এইরূপ একটি বিপর্যয়। তাহার ডালিম-ফাটা রঙ, সুঠাম গঠন, নাক মুখ চোখ অনবদ্য; অথচ আশ্চর্য এই যে সে দিনান্তে একবারের বেশী দুইবার আয়নায় মুখ দেখে না; রূপবান বলিয়া গর্ব অনুভব করা দূরের কথা, সে এজন্য বেশ একটু কুন্ঠিত। বেশী কথা, কি, সিনেমার নায়ক সাজিয়া সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিবার কল্পনা আজ পর্যন্ত তাহার মাথায় আসে নাই।

সে মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ সন্তান; কলিকাতার একটি ব্যাঙ্কে একশত পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকরি করে। তাহার জন্মকর্ম সবই পশ্চিমাঞ্চলে; লক্ষ্ণৌ তাহার মাতৃভূমি না হইলেও ধাত্রীভূমি বটে। মাত্র দুই বৎসর সে চাকরি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর; বর্তমানে সে যে পরিমাণ মাহিনা

পাইতেছে তাহাতে বিবাহ করিলে দাম্পত্যজীবন সুখময় না হইতে পারে এই বিবেচনায় সে এখনও বিবাহ করে নাই।

সোমনাথের মাতা পিতা কেহ জীবিত নাই ; একমাত্র আপনার জন আছেন—দিদি। তিনি বোম্বাইয়ে থাকেন ; জামাইবাবু সেখানে বড় চাকরি করেন।

সব দেখিয়া শুনিয়া সোমনাথের চরিত্র সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে সে নিরভিমান সাবধানী সচ্চরিত্র এবং ভালমানুষ। এরূপ চরিত্রের মানুষ জীবনে উন্নতি করিতে পারে কিনা সে গবেষণার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি এ নশ্বর জগতে ভাগ্যই বলবান।

একদিন সোমনাথ সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল। সিনেমা সে বেশী দেখিত না, তার উপর শিক্ষাদীক্ষার গুণে বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবির প্রতি তাহার পক্ষপাত বেশী। বিশেষত এই ছবিটি বোম্বাই সহরে তৈয়ার হইয়া বছরখানেক যাবৎ কলিকাতার এই চিত্রগৃহে এমন শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল যে অর্ডিনান্স জারি না করিয়া তাহাকে বন্ধ করার কোনও উপায় দেখা যাইতেছিল না। এই ছবির গান গৃহস্থ বাড়ির পোষাপাখীও কপচাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই জনমতের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া সোমনাথও ছবিটি দেখিতে আসিয়াছিল।

সন্ধ্যার শো আরম্ভ হইতে তখনও মিনিট কুড়ি দেরী আছে ; সোমনাথ চিত্রগৃহের দরদালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভিনেত্রীদের ছবিগুলি দেখিতেছিল। ইনি অশোককুমার, উনি দেবীকারাণী ; ইনি লীলা চিটনীস্, উনি পৃথ্বীরাজ। প্রত্যেকেই যেন এক একটি রাজপুত্র, রাজকন্যা! কী তাঁহাদের বেশবাস, কী তাঁহাদের মুখের ভাবব্যঞ্জনা!

দরদালানে আরও অনেক চিত্র-দর্শনাভিলাষী নরনারী ছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে, সোমনাথ লক্ষ্য করিল, একটি লোক ক্রমাগত তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং চকিত আড়চোখে তাহার পানে তাকাইতেছে। লোকটি বাঙালী নয়, তাহার মাথায় কালো রঙের টুপী এবং গায়ে লংক্লথের লম্বা কোট। বোধহয় গুজরাতি। সোমনাথ একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

ছবি আরম্ভ হইতে যখন আর মিনিট পাঁচেক বাকি আছে তখন সোমনাথ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। এই সময় লোকটি আসিয়া তাহার বাহুস্পর্শ করিল, ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিল—'মশাই, আপনি হিন্দী উর্দু বলতে পারেন?'

বিস্মিত হইয়া সোমনাথ বলিল—'পারি বৈকি।' বলিয়া পালিশ করা লক্ষ্ণৌয়া উর্দুতে বলিল,—'আমি লক্ষ্ণৌয়ে জীবন কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার অনুমতি করুন।'

উর্দু শুনিয়া লোকটি বিস্ময়ে কয়েকবার দ্রুত চক্ষু মিটিমিটি করিল তারপর আগ্রহভরে বলিল—'আমার নাম কুলীনচন্দ্র অমৃতলাল, আমি এই হাউসের ম্যানেজার আপনার সঙ্গে আমার ছুটো কথা আছে, আমার অফিসে আসবেন কি?'

সোমনাথ বলিল—'কিন্তু ছবি যে এখনি আরম্ভ হবে।'

লোকটি হাসিয়া বলিল—'তা হলেই বা। আপনি তো এ ছবি অনেকবার দেখেছেন। আজকাল যারা ছবি দেখে তারা সব রিপিট্ অডিয়েন্স্।'

সোমনাথ বলিল—'আমি এ ছবি আগে দেখি নি।'

লোকটি ক্ষণেক অবিশ্বাসভরে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—'আপনার টিকিট আমি রিফণ্ড্ করিয়ে দিচ্ছি। আমার অফিসে চলুন, আমি পাস লিখে দেব, যবে ইচ্ছে যখন ইচ্ছে ছবি দেখবেন। আজ আমার সঙ্গে কথা কইতে হবে।'

সোমনাথ বলিল—'বেশ চলুন।'

চিত্রগৃহের দ্বিতলে সম্মুখের দিকে অফিস-ঘর, কুলীনচন্দ্র সোমনাথকে সেইখানে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসাইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার আল্‌মারি, কাঁচ-ঢাকা প্রকাণ্ড টেবিল, চামড়ার গদিমোড়া চেয়ার। কুলীন ভৃত্যকে দুই পেয়ালা চা আনিবার হুকুম দিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

কুলীনচন্দ্র লোকটি কথায় অতিশয় নিপুণ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় সে কথা বলিতে লাগিল, নিজের উদ্দেশ্য প্রকট না করিয়াই সোমনাথের নিকট হইতে তাহার সমস্ত পরিচয় আদায় করিয়া লইল। সোমনাথের লুকাইবার কিছু ছিল না, সে অকপটে সমস্ত উত্তর দিল।

পরিচয় গ্রহণ করিয়া কুলীনচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চায়ে চুমুক দিল, শেষে বলিল—'আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনি বোম্বাই যেতে রাজি আছেন?'

সোমনাথ সবিস্ময়ে বলিল—'বোম্বাই!'

কুলীনচন্দ্র বলিল—'তবে সব খুলে বলি। বোম্বাইয়ে ন্যাশনল্ পিক্‌চার্স নামে একটি বড় ফিল্ম কোম্পানী আছে, এই বই কোম্পানীর কর্তা হচ্চে শ্রীনারায়ণ পিলে। পিলে সাহেব আমার খুব বন্ধু, আমার হাউসে ছাড়া তাঁর ছবি কোথাও দেখানো হয় না।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'এখন যে ছবি চল্‌ছে সে তাঁরই ছবি?'

'হ্যাঁ। তিনি খুব ভাল ছবি তৈরি করেন। এক বছরের কমে তাঁর ছবি হাউস থেকে নড়ে না—দেখতেই তো পাচ্চেন।'

'আপনার প্রস্তাব কি?'

'নারায়ণ পিল্লে সাহেব আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি নতুন আর্টিষ্ট চান। ক্রমাগত একই আর্টিষ্টের মুখ দেখে দেখে দর্শকদের চোখ পচে যায়, তাই মাঝে মাঝে রকমফের করতে হয়। আপনাকে আজ দেখেই আমার মনে হল, আপনি যদি সিনেমায় নামেন খুব নাম করতে পারেন।'

সোমনাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিল—'কিন্তু আমি যে জীবনে কখনও অভিনয় করি নি—সখের থিয়েটারেও না।'

'তাতে কোনও ক্ষতি নেই, পিল্লে সাহেব তালিম দিয়ে ঠিক করে নেবেন। তিনি বলেন, ভাল চেহারার গাধা পেলেও তিনি পিটিয়ে ঘোড়া করে নিতে পারেন।'

কথাটা তাহার পক্ষে কতদূর সম্মানসূচক তা বিবেচনা করিবার মত মনের অবস্থা সোমনাথের ছিল না, সে অত্যন্ত বিব্রতভাবে বলিল—'তা ছাড়া সিনেমাতে দেখেছি সকলেই গান গায়; আমি তো গাইতে জানি না।'

'একেবারেই জানেন না?'

সোমনাথ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'শীতকালে স্নানের সময় মাঝে মাঝে গেয়েছি বটে কিন্তু তার বেশী নয়।'

কুলীনচন্দ্র বলিল—'তাতেও কিছু আসে যায় না। আজকাল সব গানই ভাল গাইয়েকে দিয়ে প্লে-ব্যাক্ করিয়ে নেওয়া হয়। শুনুন, আমি আপনাকে সেকেণ্ড্ ক্লাস গাড়ীভাড়া দিচ্ছি, আপনি বোম্বাই গিয়ে পিল্লে সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। আমি বলছি আপনার বরাৎ ফিরে যাবে। এখানে সোয়াশ' টাকা মাহিনা পাচ্ছেন, ওখানে সুরুতেই পাঁচশ' টাকা পাবেন।'

লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু সোমনাথ মাথা-ঠাণ্ডা লোক, সে তৎক্ষণাৎ রাজি না হইয়া বলিল—'আমাকে একটু ভাবতে সময়

দিন। কাল আমি জবাব দেব।'

কুলীনচন্দ্র বলিল—'ভাল। কিন্তু এমন সুযোগ হারাবেন না সোমনাথবাবু।'

বাসায় ফিরিয়া সোমনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করিল। সে যে কাজ এখন করিতেছে তাহাতে মাহিনা কম, টিকিয়া থাকিতে পারিলে দশ বছরে আড়াইশ' টাকা বেতন হইবে; জীবনের শেষের দিকে হয়তো কিছু স্বচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইবে। তার চেয়ে এই আকস্মিক সুযোগ গ্রহণ করিয়া যদি দু'চার বছরে জীবনের স্বচ্ছলতার খোরাক যোগাড় করিয়া লইতে পারে তো মন্দ কি? টাকা ভাল জিনিষ না হইতে পারে, কিন্তু অভাব তার চেয়েও মন্দ জিনিষ। আজ সে অবিবাহিত, তার গুরুতর কোনও অভাব নাই। কিন্তু পরে?

অবশ্য বোম্বাই গেলেই যে কাজ জুটিবে এমন কোনও কথা নাই, পিলে মহাশয় তাহাকে পছন্দ না করিতে পারেন। কিন্তু কুলীনচন্দ্রের কথা শুনিয়া মনে হয়, কাজ পাইবার সম্ভাবনা বেশ প্রবল। সম্ভাবনা না থাকিলে গুজরাতি ভাই গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া তাহাকে বোম্বাই পাঠাইতে চাহিত না। সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি। যদি কাজ নাও হয় পরের খরচে বোম্বাই বেড়ানো তো হইবে। সেখানে দিদি আছেন—

অনেক চিন্তার পর সোমনাথ মনস্থির করিল, এক মাসের ছুটি লইয়া বোম্বাই যাইবে। যদি সেখানে পাকা ব্যবস্থা হয় তখন বিনা বেতনে ছুটির মেয়াদ বাড়াইয়া লইলেই চলিবে; কিম্বা অবস্থা বুঝিয়া ব্যাঙ্কের কাজে ইস্তফা দেওয়াও চলিতে পারে।

পরদিন বৈকালে সোমনাথ কুলীনচন্দ্রের সহিত দেখা করিল, বলিল—'আমি রাজি আছি।'

কুলীনচন্দ্র দু'হাতে তাহার করগ্রহণ করিয়া বলিল—'বেশ বেশ। এর পরে যখন প্রকাণ্ড হিরো হবেন তখন আমাকে মনে রাখবেন। আসুন, পিলে সাহেবের কাছে আপনার পরিচয় পত্র লিখে দিই।'

দুই

বোম্বাই পৌঁছিয়া সোমনাথ দিদির বাড়িতে উঠিল। বোম্বাই সে আগে দেখে নাই, সমুদ্রবেষ্টিত তকতকে ঝকঝকে সহর দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

সমুদ্রের উপর সহরের শ্রেষ্ঠাংশে জামাইবাবুর বাসা। তিনি রেলওয়ে বিভাগের বড় চাকুরে, সাহেবী কায়দায় থাকেন। দিদির বয়স ত্রিশ পার হইয়া গেলেও সন্তানাদি হয় নাই, স্বামী-স্ত্রী প্রায় নিঃসঙ্গভাবে বাস করেন।

জামাইবাবু খুশী হইয়া বলিলেন—'যাক, তুমি এসেছ, বাড়ির এক-ঘেয়েমী একটু কমবে।' স্ত্রীকে বলিলেন—'আর কি, ভাই সিনেমার হিরো হতে চলল, তুমিও এবার হিরোইন হয়ে নেমে পড়।'

দিদি মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—'হিরোইন তুমি হওগে যাও, আমি কোন্ দুঃখে হতে যাব? তোর জামাইবাবু ছবিতে নামলে দিব্যি মানাবে, না রে সোমু?'

জামাইবাবুর চেহারাটি গুড়ের নাগরির মত, কিন্তু চেহারা সম্বন্ধে কোনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিনি গায়ে মাখেন না। বলিলেন—কম বয়সে আমার পানেও লোকে ফিরে ফিরে চাইত, খাস ক'রে মেয়েরা। সে যাক, সোমনাথ, তোমাকে একটা উপদেশ দিই। সিনেমার মহিলারা শুনেছি লোক ভাল নয়, নিজের চরিত্রের প্রতি যদি মমতা

থাকে একটু সাবধানে চোলো।'

দিদি বলিলেন—'সে আর ওকে বলতে হবে না। কিন্তু যাই বল, ও যখন হিরো হয়ে নামবে, ছবি দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে।' বলিয়া সপ্রশংস স্নেহরসে সোমনাথকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

জামাইবাবু বলিলেন—'সেই কথাই তো বলছি। তোমারই যখন চোখ জুড়িয়ে যাবে তখন অন্য মেয়েদের কি অবস্থা হবে ভাবো।'

দিদি স্বামীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন 'মা গো, আজকাল যারা হিরো সাজে তারা কি পুরুষ মানুষ? যত সব পিলেরোগা হাড়গিলের দল।'

জামাইবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—'কাবুলিওয়ালা ছাড়া আর কাউকে তোমার দিদি পুরুষ বলেই জ্ঞান করেন না।' বলিয়া তিনি অফিসে চলিয়া গেলেন। দিদি ও জামাইবাবুর মধ্যে প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রীতি থাকিলেও সর্বদাই কথা কাটাকাটি হইয়া থাকে।

পরদিন সকালবেলা সোমনাথ নারায়ণ পিলের সহিত দেখা করিতে গেল। ন্যাশনল্ পিকচার্সের ষ্টুডিও বোম্বাই সহরের মধ্যেই। জামাইবাবু অফিস যাইবার পথে সোমনাথকে নিজের মোটরে ষ্টুডিওর ফাটক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

ফাটকে পাঠান শান্ত্রীর পাহারা। সোমনাথ পূর্বে কখনও সিনেমা ষ্টুডিওর সিংহদ্বার পার হয় নাই, সে মনে একটু উদ্বেগ লইয়া প্রবেশ করিল। পাঠান দ্বারপাল তাহাকে মোটর হইতে নামিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বাধা দিল না।

অনেকখানি জমির উপর ষ্টুডিও। মাঝখানে ইষ্টিশানের মত প্রকাণ্ড উঁচু একটা করোগেটের ছাউনি; আশে পাশে পিছনে ছোট বড় অনেকগুলি বাড়ি। কোনও বাড়ির দ্বারে লেখা—'মিউজিক', কোনও বাড়িতে—'এডিটিং', কোথাও বা—'মেক আপ'। অনেক

লোক চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব; কিন্তু চেঁচামেচি হট্টগোল নাই। সোমনাথ দেখিল, কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ রঙীন কাপড় পরিয়া মুখে রঙ্ মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা সম্ভবতঃ অভিনেতা অভিনেত্রী। এই সময় একটা ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। রঙ্ মাখা কুশীলবগণ তাড়াতাড়ি গিয়া ইষ্টিশানে ঢুকিয়া পড়িল।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সোমনাথ দেখিল একটা বড় বাড়ির সম্মুখে লেখা আছে—'অফিস্'। পিলে মহাশয়কে এইখানেই পাওয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

একটি ঘরে টেবিল চেয়ার সাজানো, পিলে মহাশয়ের দর্শনভিক্ষু কয়েকজন লোক সেখানে বসিয়া আছে। সোমনাথ প্রবেশ করিতেই একজন ছোকরা সেক্রেটারি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কি দরকার?'

সোমনাথ সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া কুলীনচন্দ্রের পরিচয়পত্র তাহাকে দিল। সেক্রেটারী বলিল—'আপনি বসুন, আমি 'বস্'কে খবর দিচ্ছি।'

সেক্রেটারী ভিতর দিকে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল—'বস্ এখন ভারি ব্যস্ত আছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

সোমনাথ বসিয়া রহিল। দর্শনপ্রার্থীরা একে একে দেখা করিয়া প্রস্থান করিল; আরও নূতন দর্শনপ্রার্থী আসিল। সোমনাথের মনে হইল, সে যেন মধ্যযুগের ইংলণ্ডে রাজ-সন্দর্শনে আসিয়াছে, ante-chamber-য়ে প্রতীক্ষা করিতেছে, সমন আসিলেই রাজ-দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।

ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সোমনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিল।

দর্শনপ্রার্থীরা, যাহারা পরে আসিয়াছিল, তাহারাও কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে, অথচ তাহার ডাক পড়িল না। ঘরে অন্য কেহ নাই, সেক্রেটারীও কিছুক্ষণ যাবৎ অদৃশ্য হইয়াছে। সোমনাথ ভাবিল, আর রাজ-দর্শনে কাজ নাই, ফিরিয়া যাই। এরা কি রকম লোক, খোসামদ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়া দেখা করে না?

সোমনাথ তখনও জানিত না, সিনেমা-সমাজের ইহাই এটিকেট্। যে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহাকে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখিতে হইবে, বা 'আজ দেখা হইবে না' বলিয়া বারবার হাঁটাহাঁটি করাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার কদর কিছু নাই। সিনেমাওয়ালা-দের টাকা আছে, তাই গরজ নাই। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব?

সোমনাথ উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভিতরের দরজার দিকে চোখ তুলিয়া অবাক হইয়া গেল। দ্বারের কাছে একটি অপূর্ব মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে এবং মোহ-ভরা চোখে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সোমনাথ ভাবিল, ছবি নাকি? বিচিত্র কবরীবন্ধ, দীঘল সুঠাম দেহে অপরূপ আভরণ, মুখখানি যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। কিন্তু ছবি নয়। পরক্ষণেই মৃদু হাস্যে কুন্দদন্ত ঈষৎ মোচন করিয়া তরুণী সোমনাথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, মধুপ-গুঞ্জরের মত মিষ্ট ইংরাজীতে বলিলেন—'আপনিই কি মিষ্টার সোমনাথ—কলকাতা থেকে আসছেন?'

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোমনাথ বলিল—'হ্যাঁ'

তরুণীর মোহ-মোহ চক্ষু দুটি যেন বিগলিত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন—'আমি মিসেস পিলে, আমার নাম চন্দনা দেবী।'

নামটা যেন চেনা চেনা। তারপর সোমনাথের মনে পড়িয়া গেল,

বহু প্রাচীরপত্রে ঐ নাম ঐ মুখ সে দেখিয়াছে—সিনেমা রাজ্যের অমুকুটিত সাম্রাজ্ঞী চন্দনা দেবী। সোমনাথ করতল যুক্ত করিয়া নত হইয়া নিজ কৃতার্থতা জ্ঞাপন করিল।

চন্দনা দেবী বলিলেন—'আমার স্বামী এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ; আমিও থাকতাম, কিন্তু সেটে আমার কাজ আছে। আশা করি আবার দেখা হবে—টা টা।

একটু হাসিয়া একটু ঘাড় নাড়িয়া কুহকময়ী বাহিরের দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সোমনাথের মনের ঘোর ভাল করিয়া কাটিবার আগেই সেক্রেটারী আসিয়া বলিল—'আসুন—'বস্' আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বসিবার ঘরের পর সেক্রেটারীর ঘর, তারপর 'বসের' ঘর। দ্বারের ভারি পর্দ্দা সরাইয়া সেক্রেটারী সোমনাথের প্রবেশের পথ করিয়া দিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সোমনাথের নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ঘরে গুরুভার একটা সুগন্ধ সাঁঝাল্ ধোঁয়ার মত ভারি হইয়া বসিয়াছে। ঘরটি আধা-আলো আধা-অন্ধকার।

সোমনাথের ইন্দ্রিয়গ্রাম এই নূতন পরিবেশে অভ্যস্ত হইলে সে দেখিল ঘরের কোণে টেবিলের সম্মুখে একটি লোক বসিয়া আছে।

লোকটিকে দেখিয়া সোমনাথ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইনিই নারায়ণ পিলে—নটীশিরোমণি চন্দনা দেবীর স্বামী এবং দিগ্বিজয়ী চিত্র-প্রণেতা। গায়ের রং হুঁকার খোলের চেয়েও কালো ; শীর্ণ খর্ব চেহারা, মুখখানি দেখিয়া মনে হয় একতাল কাদা কেহ দুই হাতে থাসিয়া স্কন্ধের উপর বসাইয়া দিয়াছে ; এই কাদার তালের মধ্যে একজোড়া রক্তবর্ণ তির্য্যকচক্ষু ; সর্বোপরি পরিধানে গাঢ় নীলরঙের কোট প্যাণ্ট্।

সোমনাথ ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া পিলে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'আসুন, এই চেয়ারে বসুন।'

হঠাৎ সোমনাথের একটি উপমা মনে পড়িল ; লোকটি যেন একটি কালো রঙের ফাউন্টেন পেন। গলায় সোনালি রঙের টাই উপমাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। সোমনাথ পরে জানিতে পারিয়াছিল উপমাটি তাহার নূতন আবিষ্কার নয়, সিনেমাসমাজের অনেকেই আড়ালে পিলে সাহেবকে ফাউন্টেন পেন বলিয়া উল্লেখ করে।

সোমনাথ পিলে সাহেবের সম্মুখের চেয়ারে বসিল ; কিছুক্ষণ দুইজনে দৃষ্টি বিনিময় হইল। পিলে সাহেবের চক্ষু তির্যক ও রক্তবর্ণ হইলেও পর্যবেক্ষণে অপটু নয়, সৌষ্ঠবহীন মুখখানাতে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ শেষ করিয়া তিনি আস্তে আস্তে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। নেহাৎ মামুলি কথা, এমন কি অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে হয় ; তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীও একটু নির্জীব ধরণের। সোমনাথ বসিয়া শুনিতে লাগিল—

'কুলীনভাই আপনাকে পাঠিয়েছেন—কুলীনভাই আমার প্রিয় বন্ধু। তাঁর আলাদা চিঠিও আমি এয়ার মেলে পেয়েছি।...আপনি সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রিতে নতুন লোক, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান...নতুন রক্ত আমাদের দরকার, কিন্তু ভদ্রসন্তানকে এ পথে আনতে শঙ্কা হয়...সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে—প্রতিভা নেই, শিক্ষা নেই, চরিত্র নেই। এই সিনেমা জগৎ খুঁজলে আপনি এমন লোক পাবেন না যাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করা যায়। সবাই অর্থলোভী জোচ্চোর, চরিত্রহীন লম্পট। আপনি এ লাইনে নতুন আসছেন তাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি—'

এই সময় সোমনাথ টের পাইল পিলে সাহেবের মুখ দিয়া ভক্ ভক্

করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। সকাল বেলাই তিনি মদ্যপান করিয়াছেন। পরে সোমনাথ জানিতে পারিয়াছিল, পিলে সাহেব অহোরাত্র মদে চুর হইয়া থাকেন। ঘরে তীক্ষ্ণ সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইবার উদ্দেশ্য বোধহয় পিলে সাহেবের মুখনিঃসৃত মদের গন্ধকে চাপা দেওয়া।

পিলে সাহেব শান্ত কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—'ছবি তৈরি করার একটা নেশা আছে, তার ওপর কাঁচা পয়সার লোভ···দুনিয়ার যত ঠক বদমায়েস এইখানে এসে জুটেছে। তাদের একমাত্র গুণ তারা মন জুগিয়ে কথা বলতে পারে। ভালো লোক এখানে আমল পায় না, যারা আসে তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। ভদ্রলোকের যায়গা এ নয়। অথচ এই চিত্রশিল্পের যে কী অসীম সম্ভাবনা তা বলা যায় না—'

পিলে সাহেবের মনে বোধহয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বহু গ্লানি সঞ্চিত হইয়াছিল; তিনি সম্ভবত নূতন লোক পাইলে এইভাবে হৃদয়ভার লাঘব করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন বাধা পড়িল। দরজায় টোকা দিয়া, একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইনি জীবরাজ নাগর। গোলগাল মানুষ, পিলে সাহেবের সরকারী ডিরেক্টর। পিলে সাহেব ছবির ডিরেক্টর হইলেও কখনও সেটে যান না, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নাগর মহাশয় সেটের যাবতীয় কাজ করেন।

নাগর বলিলেন—'একটা শট্ কি করে নেব বুঝতে পারছি না।'

পিলে সাহেবের মুখের অলস নির্জীব ভাব মুহূর্তে কাটিয়া গেল। তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন—'কোন্ শট্?'

'হিরোইন যাতে রাজাকে প্রণাম করছেন। ডায়লগ নেই, শুধু একটু ফোঁপানো।'

'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—'

পিলে লাফাইয়া উঠিয়া মাঝখানে দাঁড়াইলেন; সোমনাথের উপস্থিতি কেহই গ্রাহ্য করিল না।

পিলে নাগরকে বললেন—'তুমি মেঝেয় শোও।'

জীবরাজ নাগর তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর লম্বা শুইয়া পড়িলেন।

পিলে বলিলেন—'এবার ছাখো এটা মিড শট্—ক্যামেরা ঐখানে বসবে। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছেন—মেয়ে খবর পেয়ে ছুটে তাঁকে দেখতে আসছেন—কেমন? এইবার ছাখো—মেয়ে চারিদিকের মৃতদেহের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছেন, এইবার রাজাকে দেখতে পেলেন, এইভাবে ছুটে এসে তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে পড়লেন, তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাঁর পায়ের ওপর এমনি ভাবে—বুঝলে?' পিলে নাগরের জুতাপরা পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

সোমনাথ চমৎকৃত হইয়া দেখিতে লাগিল। রাজকুমারীর প্রত্যেকটি ভঙ্গী প্রত্যেকটি মুখভাব এই কদাকার লোকটি এমন নিঃসংশয় ভাবে অভিব্যক্ত করিল যে সোমনাথ বিস্মিত হইয়া গেল। জীবরাজ নাগর গাত্রোত্থান পূর্বক গা ঝাড়া দিয়া প্রস্থান করিবার পর সে বলিল—'আপনি অভিনয় করেন না কেন?'

পলকের জন্য পিলের তিক্ত অন্তর প্রকাশ পাইল; তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—'পাবলিক অভিনয় চায় না, সুন্দর চেহারা চায়। হয়তো কোনও দিন আমি অভিনয় করব, যেদিন আমার চেহারার উপযুক্ত পার্ট পাব। কিন্তু ওকথা যাক।'

দেরাজ হইতে একটা ছাপা ফর্ম বাহির করিয়া বলিলেন—'আপনাকে আমি নেব। আপনি নতুন লোক, কিন্তু লোক আমি তৈরি করে নিতে পারি। নিন কনট্রাক্টে সই করুন।'

সোমনাথ চুক্তিপত্র পড়িয়া দেখিল, তিন মাসের জন্ত পাঁচশত টাকা বেতনে তাহাকে অভিনেতা নিযুক্ত করা হইল ; কোম্পানীর অপশান থাকিবে তিনমাস পরে দীর্ঘতর মেয়াদে তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিবে। আপত্তিজনক কিছু না পাইয়া সোমনাথ দস্তখৎ করিয়া দিল।

পিলে বলিলেন—'অবশ্য আমি একটা risk নিচ্ছি। আপনার ফটোগ্রাফিক টেষ্ট্ আর গলার সাউণ্ড টেষ্ট্ নিতে হবে, যদি ভাল না আসে তাহলে আপনাকে ব্যবহার করতে পারব না। আমার দেড় হাজার টাকা অকারণে খরচ হবে।'

সোমনাথ বলিল—'আমার টেষ্ট্ যদি পছন্দসই না হয় আমি কিছুই দাবী করব না।'

পিলে উঠিয়া তাহার করমর্দন করিলেন—'Thank you. I think I am going to like you. কাল এই সময় আসবেন, আপনার টেষ্ট্ নেবার ব্যবস্থা করে রাখব।'

পরদিন সোমনাথের টেষ্ট্ লওয়া হইল। এমন বিষম পরীক্ষা তাহার জীবনে কখনও আসে নাই। সামনে ক্যামেরা, মাথার উপর মাইক ঝুলিতেছে, চারিদিকে চোখ-ধাঁধানো উগ্র আলো ; তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া ডায়লগ্ বলিতে হইবে। সোমনাথ সবই নির্দেশ-মত করিল বটে কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহার দৃঢ় ধারণা হইল সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। সিনেমার হিরো হওয়া তাহার কর্ম নয়। নিজের অক্ষমতায় মনমরা হইয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে পিলে সাহেবের সেক্রেটারি টেলিফোনে খবর দিল—'টেষ্ট্ ভাল হয়েছে—আপনি আসুন।'

সোমনাথের চিত্রজীবন আরম্ভ হইল।

তিন

পিলে সাহেব সোমনাথকে জানাইলেন, যে ছবিটি সত্ত আরম্ভ হইয়াছে তাহাতেই সে নায়কের ভূমিকা পাইবে। ছবির শুটিং আরম্ভ হইয়া গিয়াছে অথচ নায়ক নির্বাচিত হয় নাই ইহাতে সোমনাথ আশ্চর্য হইল। কিন্তু পিলে সাহেব গল্পটি যখন তাহাকে শুনাইলেন তখন সোমনাথ বুঝিল, নায়ক নামমাত্র, নায়িকা চন্দনা দেবীই ছবি জুড়িয়া আছেন। ইহাতে দুঃখিত না হইয়া সে বরং মনে হাঁফ ছাড়িল। প্রথম ছবিতে তাহার ঘাড়ে বেশী ঝুঁকি পড়িবে না।

পিলে সাহেব তাহাকে কয়েকদিন তালিম দিলেন। তারপর সে রঙীন কাপড় পরিয়া মুখে রঙ মাখিয়া ক্যামেরার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

কাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে ষ্টুডিওর সকলের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হইল। সিনেমাক্ষেত্র জগন্নাথক্ষেত্র—হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, পাঞ্জাবী, মারাঠি, গুজরাতী, কেহই পুণ্যক্ষেত্র হইতে বাদ পড়ে নাই। একটি যুবকের সহিত সোমনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মিল, সে কমিক অ্যাক্টর পাণ্ডুরঙ যোশী। পাণ্ডুরঙ ভাঁড়ামি করে বটে কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান লোক।

বলা বাহুল্য কর্মসূত্রে চন্দনা দেবীর সঙ্গেও তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, কিন্তু স্ত্রীচরিত্রে অজ্ঞতার জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক চন্দনা দেবীকে সে ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। তিনি সর্বদাই হাসিমুখে কথা বলেন, কখনও কখনও অন্তরঙ্গ ভাবে ব্যক্তিগত কথাও বলেন, অথচ মনে হয় তাঁহার প্রচ্ছন্ন মন ধরা দিতেছে না; তাঁহার সুন্দর চোখে যখন আন্তরিকতা জ্বলজ্বল করিতেছে তখনও সন্দেহ হয় তিনি অভিনয় করিতেছেন।

তাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথাও সোমনাথের মনে আসিল না। স্বামীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে কোনও ত্রুটি দেখিতে পায় নাই। পিলে সাহেবের অফিস ঘরে যখনই চন্দনা দেবী দেখা দেন, স্বামীর চেয়ারের হাতলে বসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া কথা বলেন, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন হওয়া উচিত তেমনই সহজ প্রীতির সম্পর্ক। সিনেমা অভিনেত্রীদের নামে যে সকল দুর্নাম আছে তাহা অন্যের পক্ষে সত্য হইতে পারে কিন্তু চন্দনা দেবী সম্বন্ধে কখনই সত্য নয়।

এদিকে ছবির কাজ চলিতেছে। সোমনাথকে প্রায়ই সেটের উপর চন্দনা দেবীর সহিত প্রেমালাপ করিতে হয়, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে হয়। চন্দনা দেবীর প্রেমাভিনয় বিখ্যাত; হাসি চাহনি বাচনভঙ্গীর দ্বারা তিনি এমন রোমাঞ্চকর সম্মোহ সৃষ্টি করিতে পারেন যে, দর্শক মাত্রেরই রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে বয়সের দোষে সোমনাথের যদি চিত্ত চঞ্চল হইত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না; কিন্তু সোমনাথের একটি রক্ষাকবচ ছিল; বিবাহিতা নারী সম্বন্ধে তাহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে পরস্ত্রী মাতৃবৎ। উপরন্তু সোমনাথ পিলে সাহেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মনে মনে তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং গুরুপত্নী সম্বন্ধে তাহার মন যে সম্পূর্ণ অন্য ভাব পোষণ করিবে তাহা বলা বাহুল্য।

পিলে সাহেবও তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরল বিনীত স্বভাব দেখিয়া তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন—"Somnath, my boy, you leave everything to me. I'll make you the greatest leading man India has yet preducod."

নূতন কাজে মাসখানেক বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। অবস্থা বুঝিয়া সোমনাথ ব্যাঙ্কের চাকরীতে ইস্তফা দিল।

হিরোর অধিকারে সে ষ্টুডিওতে একটি নিজস্ব ঘর পাইয়াছিল। ঘরটি টেবিল চেয়ার আয়না কৌচ প্রভৃতি দিয়া পরিপাটি ভাবে সাজানো। কাজের ফাঁকে সে এই ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিত। পাণ্ডুরঙ্ যোশীও ফুরসৎ পাইলেই আসিয়া তাহার সহিত আড্ডা জমাইত।

একদিন দুপুরবেলা পাণ্ডুরঙ্ ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—'বন্ধু, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। জানতে পেরেছি তোমার বরাত খুলেছে।'

সামনাথ কৌচে কাৎ হইয়া নভেল পড়িতেছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল,—'সে কি, কী হয়েছে?'

তাহার পাশে বসিয়া পাণ্ডুরঙ্ ভর্ৎসনার সুরে বলিল,—কেন মিছে ছলনা করছ দোস্ত। দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, আমাদের দেখেই সুখ। এতে লুকোচুরির কি আছে?'

'কি দেবী? কার কথা বলছ?'

'দেবী এ ষ্টুডিওতে কটা আছে?'

'চন্দনা দেবীর কথা বলছ?'

পাণ্ডুরঙ্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোমনাথের পানে চাহিল। সে সোমনাথের মন বুঝিতে আসিয়াছিল, সম্ভব হইলে বন্ধুভাবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার ইচ্ছাও ছিল; কিন্তু সোমনাথের ভাব দেখিয়া তাহার ধোঁকা লাগিল। সে বলিল—'হ্যাঁ, সেই দেবীর কথাই হচ্ছে। ওর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ঠিক করে আমায় বল দেখি।'

সোমনাথ বলিল, 'ধারণা তো বেশ ভালই। মন্দ মনে করার কোনও কারণ হয় নি।'

পাণ্ডুরঙ্ ভ্রূ তুলিল,—'হুঁ! কাল যখন তোমরা সেটের উপর অভিনয় করছিলে, উনি পিছন দিক থেকে এসে তোমার কাঁধে হাত দিয়ে মাথার ওপর গাল রেখেছিলেন, তখনও কিছু মনে হয় নি?'

'না। অভিনয়—অভিনয়। তার আবার মনে হবে কি?'

পাণ্ডুরঙ্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর সোমনাথের কৌটা হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—'ভাই, সিনেমা সমুদ্রে তুমি নতুন ডুবুরি, হালচাল সব জানো না। আমি পুরোনো পাপী, দেবীকে অনেক দিন থেকে দেখছি। দেবী গভীর জলের মাছ।'

সোমনাথ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—'পাণ্ডুরঙ্, যা বলবে পরিষ্কার করে বল, আমি অত বাঁকা কথা বুঝতে পারি না।'

পাণ্ডুরঙ্ কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়া বলিল—'আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দেবীর বয়স কত তোমার মনে হয়?'

সোমনাথ বলিল—'জানি না। পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বোধ হয়।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'দেবীর বয়স কম-সে-কম পঁয়ত্রিশ বছর। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। তিনি গত পনেরো বছর ধরে ছবিতে হিরোইন সাজছেন, তার আগে দু'বছর মাইনর পার্ট করেছেন। সুতরাং বয়স কত হিসেব করে ত্যাখো।'

সোমনাথের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, তবু সে বলিল—'তাই যদি হয় তাতেই বা দোষ কি? বরং প্রশংসার কথা।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ভাই, দোষ আমি কাউকে দিচ্ছি না। সতেরো বছর বয়স থেকে পেটের দায়ে ভাঁড়ামি করছি, এটুকু বুঝেছি কোনও কাজের জন্যেই কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, সবই নিয়তির খেলা। আমি বুঝতে পেরেছি দেবীর মন তোমার দিকে ঢলেছে।

তুমি যদি রাজি থাকো অভিনন্দন জানাচ্ছি; আর যদি রাজি না থাকো সাবধান হয়ো।'

সোমনাথ বলিল—'ও সবে আমার রুচি নেই এবং তোমার অনুমান যে ঠিক তাতেও আমার সন্দেহ আছে।'

পাণ্ডুরঙ হাসিল—এসব বিষয়ে আমার ভুল হয় না। দেবীর মনে রঙ ধরেছে। এর আগেও বার তিনেক দেখেছি কিনা।' বলিয়া সংক্ষেপে দেবীর পূর্ব্বতন কয়েকটি রোমান্সের উল্লেখ করিল।

শুনিয়া সোমনাথ সবিস্ময়ে বলিল—'বল কি। মিঃ পিলে জানতে পারেন নি?'

'উহুঁ। ঐখানেই দেবীর মাহাত্ম্য। এমন সাফাই হাতে কাজ করেন ধরা-ছোঁয়া যায় না; কিন্তু এও বলে দিচ্ছি, ফাউণ্টেন পেনের কাছে দেবী যেদিন ধরা পড়বেন সেদিন ওঁর নায়িকা জীবন শেষ হবে।'

'কেন?'

'দেবীর রূপ আছে, বুদ্ধি আছে, আর্টিষ্টও ভাল, কিন্তু ওঁকে খাড়া করে রেখেছে পিলে। পিলে ছাড়া আর কেউ দেবীকে ব্যবহার করতে পারবে না। তাই বলছি, পিলে যদি কোনও দিন দেবীকে তাড়িয়ে দেয় তখন ওঁর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। দেবীও সেকথা জানেন, তাই এত লুকোচুরি।'

এই আলোচনার পর সোমনাথ একটু সতর্ক হইল। পাণ্ডুরঙ যে ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তি তাহা ক্রমে তাহার অনভিজ্ঞ চোখেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। চন্দনা দেবী প্রথম দর্শনেই সোমনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অতি কৌশলে সূক্ষ্ম প্রলোভনের জাল পাতিয়া ছিলেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি সোমনাথ অত মিহি ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই। চন্দনা দেবীও অনুভব করিয়াছিলেন যে

সোমনাথ আনাড়ি। তাঁহার লিপ্সা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন চন্দনা দেবী বেশ স্পষ্ট ইসারা দিলেন; এমন ইসারা যে অন্ধ ব্যক্তিও দেখিতে পায়।

ছবির শূটিং অর্ধেকের অধিক শেষ হইয়াছে, পিলে সাহেব হুকুম দিলেন আউট-ডোর শূটিং আরম্ভ করিতে হইবে। বোম্বায়ের বাহিরে কিছু দূরে অনেক রমণীয় নিসর্গদৃশ্য আছে, পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, সমুদ্র কিছুরই অভাব নাই; স্থির হইল জঙ্গলপ্রধান একটি স্থানে গিয়া ছবি তোলা হইবে। নায়ক নায়িকা জঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি খেলিবে এবং ডুয়েট গান গাহিবে।

স্থানটি সহরের বাহিরে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। যথাসময়ে মোটর সহযোগে শূটিং পার্টি ওকুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিল। কর্মকর্তা নাগর; পিলে অভ্যাসমত আসেন নাই। অভিনেতাদের মধ্যে কেবল চন্দনা দেবী এবং সোমনাথ, তাছাড়া যন্ত্র এবং যন্ত্রী তো আছেই।

একটি ছোট মোটরে কেবল সোমনাথ ও চন্দনা চলিয়াছেন। আর কেহ নাই। দুজনেই রঙ্ মাখিয়া দৃশ্যোপযোগী বেশ পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, খোলা যায়গায় প্রসাধনের সুবিধা নাই। চন্দনা দেবীর চোখে বিলাতী কাজল, চোখের পক্ষ্মগুলি দীর্ঘ ও ছায়ানিবিড় দেখাইতেছে।

ধাবমান গাড়ীর বায়ুপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দু'একটি কথা হইতেছে; মাঝে মাঝে চন্দনা দেবী পাশে উপবিষ্ট সোমনাথের প্রতি অলস অপাঙ্গদৃষ্টি করিতেছেন। গাড়ী যখন মোড় ফিরিতেছে তখন একজন অন্যের গায়ে হেলিয়া পড়িতেছেন, কাঁধে কাঁধে ঠেকাঠেকি হইতেছে। সোমনাথ কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য

হাসিমুখে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া চিত্তচাঞ্চল্যের কোনও লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে না। চন্দনা দেবী তখন মোহ-মোহ দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে তাহাকে দেখিতেছেন, দৃষ্টির অকথিত তিরস্কার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, এমন সুযোগ পেয়েও তুমি অবহেলা করছ? তুমি মানুষ না পাথর?

হঠাৎ চন্দনা প্রশ্ন করলেন—'আপনার বয়স কত?'

সোমনাথ চকিতে তাঁহার দিকে ফিরিল, বলিল—'ছাব্বিশে পড়েছি।'

চন্দনা কিছুক্ষণ স্বপ্নালু চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'ছাব্বিশ বছর বয়সে মানুষের মন কেমন হয় তা কে জানে। খুব বেশী বুড়ো মনে হয় কি?'

'না—যদি বাধা না থাকে, আপনার বয়স কত?'

চন্দনা সরল ভাবে বলিলেন—'আগামী ২৭শে আমার জন্ম দিন—বাইশ বছর পূরবে।'

চোখে পাছে অবিশ্বাস ফুটিয়া ওঠে তাই সোমনাথ তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর চন্দনা বলিলেন—'মিঃ পিলের বয়স কত জানেন?'

সোমনাথ সাবধানে বলিল—'ঠিক বলতে পারি না—চল্লিশের কাছাকাছি হবে বোধ হয়।'

'মিঃ পিলের বয়স পঞ্চান্ন।' চন্দনা একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন; তাঁহার কাঁচুলি বাঁধা বক্ষস্থল উত্থিত হইয়া আবার পতিত হইল।

সোমনাথ চুপ করিয়া রহিল। বাকি পথটা আর কোনও উল্লেখ-যোগ্য কথা হইল না।

ওকুস্থলে পৌঁছিয়া সকলে কাজে লাগিয়া গেল। স্থানটি সত্যই ছবির

মত ; চারিদিকে গাছপালা, কোথাও জন মানব নাই—যুবক যুবতীর প্রণয় লীলার উপযুক্ত ক্রীড়াভূমি। যন্ত্রপাতি সাজাইয়া ছবি তুলিতে গিয়া কিন্তু এক বাধা উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহারা কেবলি আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিতে লাগিল। প্রখর একটানা সূর্যালোক না পাইলে ফটোগ্রাফ ভাল হয় না। জীবরাজ নাগর কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন—'মেঘ কেটে না গেলে কিছু হবে না। অপেক্ষা করতে হবে।'

চন্দনা গাছতলায় একটি টুলের উপর বসিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ যেন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন ; শেষে বলিলেন—'উপায় কি ? কিন্তু বসে বসেই বা কি করা যায় ? চলুন মিঃ সোমনাথ, ঐদিকের জঙ্গলটা explore করে আসা যাক।—নাগরজি, সময় হলে মোটরের হর্ণ বাজাবেন, আমরা ফিরে আসব।'

সোমনাথ আপত্তি করিল না। খোলা যায়গায় সূর্যের ঝাঁঝ বেশী, এখানে বসিয়া থাকার চেয়ে বনের ছায়ায় তবু ঠাণ্ডা পাওয়া যাইবে।

দু'জনে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যতই দূরে যাইতে লাগিলেন বন ততই ঘন হইতে লাগিল। জংলী গাছপালার গাঢ় পত্রাবরণের নীচে একটি সজল স্নিগ্ধতা বিরাজ করিতেছে। বনভূমির উপর যেন চিত্রমৃগের অজিন বিছানো। আলোর রঙ্ ক্রমে সবুজ হইয়া আসিল।

একটি গানের কলি গুঞ্জন করিতে করিতে চন্দনা চলিয়াছেন, পাশে সোমনাথ। থাকিয়া থাকিয়া চন্দনা সোমনাথের দিকে হরিণায়ত দৃষ্টি ফিরাইতেছেন ; কথাবার্তা কিছু হইতেছে না।

একটি গাছের ডাল হইতে সপুষ্প অর্কিডের লতা ঝুলিয়া ছিল, চন্দনা

সেটি তুলিয়া খোঁপায় দিলেন। বলিলেন—'এই রকম বনে এলে আমার মনে হয় আমি যেন বনের প্রাণী—সংসার নেই, সংস্কার নেই, একেবারে আদিম মানবী। আপনার মনে হয় না ?'

সোমনাথ বলিল—'কৈ এখনও তো মনে হচ্ছে না। দেখুন দেখুন, জল—!'

দ্রুত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সোমনাথ দেখিল, বনের নামাল জমির উপর তরুবেষ্টিত একটি ছোট্ট জলাশয়। কাকচক্ষু জল, তল পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

দু'জনে জলাশয়ের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। চন্দনা জলে হাত ডুবাইয়া বলিলেন—'আঃ, কী ঠাণ্ডা জল!' তাঁর চোখে সহসা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, 'আমি স্নান করব। আপনি করবেন ?'

সোমনাথ বলিল—'সে কি, মেক-আপ্ ধুয়ে যাবে যে।'

'গলা পর্যন্ত জলে নামব, মেক্-আপ্ ভিজবে না।'

'কিন্তু কাপড়-চোপড় ? এখানে তো বদ্‌লানোও যাবে না।'

চন্দনা অচপল দৃষ্টি সোমনাথের মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন—'কাপড়-চোপড় কিনারায় থাকবে।'

সেমানাথ প্রথমটা বুঝিতে পারিল না; তারপর একঝলক রক্ত আসিয়া তাহার রঙ্-মাখা মুখখানাকে আরও লাল করিয়া দিল। অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া সে কষ্টে গলা দিয়া আওয়াজ বাহির করিল—'না' আমি নাইব না।'

'নাইবেন না ?'

'না।'

চন্দনা ভ্রূর একটি ভঙ্গী করিলেন—'বেশ' আমি একাই নাই তাহলে। এমন জল পেয়ে আমি ছেড়ে দেব না।'

চন্দনার কথাগুলো অদ্ভুত ইঙ্গিতপূর্ণ শুনাইল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি

জলের কিনারা হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়াচ্ছি, আপনি স্নান করুন।'

সোমনাথ একটা গাছের ডাল ধরিয়া জলের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে পিছন হইতে জলের শব্দ আসিতে লাগিল। চন্দনা দেবী বৃন্দাবনের গোপিনীর ন্যায় লজ্জা সরম তীরে রাখিয়া জলে নামিয়াছেন। সোমনাথ আরও একটু দূরে—শব্দের এলাকার বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। অমনি পিছন হইতে আওয়াজ আসিল—'বেশী দূরে চলে যাবেন না—আমার কাপড়-চোপড় কেউ যদি চুরি করে নিয়ে যায়—

সোমনাথের প্রবল ইচ্ছা হইল একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়; কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা দমন করিয়া ঘাসের উপর বসিল এবং তপ্তমুখে একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর দূর হইতে মোটর হর্ণের ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

চার

অপরাহ্নে যখন সোমনাথ বাড়ি ফিরিল তখন তাহার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতেছে।

এ এমন কথা যে দিদির কাছে বলা যায় না। অথচ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ বিশেষ দরকার; নিজের বুদ্ধিতে সব দিক রক্ষা করিয়া বেড়াজাল হইতে বাহির হইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই। চন্দনা দেবী প্রবীণা শবরী, এত অল্পে শিকার ছাড়িয়া দিবেন না।

বাড়ি ফিরিয়া একটা সুরাহা হইল। দিদি মোটরে চড়িয়া বাজার

করিতে গিয়াছিলেন; জামাইবাবু একাকী বারান্দায় বসিয়া চা সহযোগে জলযোগ করিতেছিলেন। সোমনাথ স্থির করিল জামাইবাবুকে ব্যাপারটা বলিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিবে। জামাই-বাবুকেও বলিতে লজ্জা করিবে; কিন্তু উপায় নাই।

সোমনাথের জন্য চা জলখাবার আসিল। দু'জনে কিছুক্ষণ পানাহারে নিবিষ্ট রহিলেন। সোমনাথ কথাটা কি ভাবে পাড়িবে মনে মনে গুছাইয়া লইতেছে এমন সময় জামাইবাবু বলিলেন—'কলকাতা থেকে দাদা চিঠি লিখেছেন—রত্না কাল আসছে।'

রত্না জামাইবাবুর ছোট বোন; আই এ পরীক্ষা দিয়া মেজদার কাছে বোম্বাই বেড়াইতে আসিতেছে। রত্না তাহার দুই দাদা ও বৌদিদিদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাই সকলের আদরিণী। সোমনাথ অবশ্য রত্নাকে ছেলেবেলা হইতে দেখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। রত্না বড় গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করা সোমনাথের সাধ্য নয়। [illegible] দিদির এই স্বল্পভাষিণী স্বাধীন মনের ননদটিকে সে মনে মনে [illegible] পছন্দ করিত।

সে জিজ্ঞাসা করিল—'কার সঙ্গে আসছে?

জামাইবাবু হাসিলেন—'কার সঙ্গে আবার—একলা আসছে। রত্নার শরীরে কি ভয়-ডর আছে? তাছাড়া পথের হাঙ্গাম কিছু নেই; দাদা হাওড়ায় গাড়ীতে তুলে দিয়েছেন, কাল দুপুরে আমি ভি টিতে নামিয়ে নেব।'

দু'একটা সাধারণ কথার পর সোমনাথ গলা ঝাড়া দিয়া বলিল—'জামাইবাবু, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে—' বলিয়া লজ্জা-বিব্রত মুখে কতকটা অসংলগ্নভাবে চন্দনা দেবীর উপাখ্যান বলিল।

শুনিয়া জামাইবাবুর মুখ গম্ভীর হইল। মনে মনে কিছুক্ষণ তোলাপাড়া করিয়া তিনি শেষে বলিলেন—'গোড়া থেকেই আমার ভয় ছিল। অবশ্য তুমি যদি শক্ত থাকতে পারো তাহলে কোনও ভয় নেই; কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে 'বসের' স্ত্রীকে তো আর অপমান করা যায় না। যা হোক যথাসম্ভব সাবধানে চলবে। যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।'

পথনির্দেশ হিসাবে জামাইবাবুর পরামর্শ খুব মূল্যবান না হইলেও তাঁহার সহানুভূতি পাইয়া সোমনাথের মনের অস্বস্তি অনেকটা লাঘব হইল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া প্রাতরাশ গ্রহণের সময় দিদি হঠাৎ বলিলেন—'এবার সমুর বিয়ে দেওয়া দরকার।'

সোমনাথের সন্দেহ রহিল না যে রাত্রে দিদি জামাইবাবুর কাছে সবই শুনিয়াছেন; কিন্তু বিবাহ করলেই তো সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। উপস্থিত যে শিরে সংক্রান্তি।

সোমনাথ সাড়াশব্দ না দিয়া টোষ্ট চিবাইতেছে দেখিয়া দিদি আবার বলিলেন—'তোর যদি মনে মনে কোনও মেয়ে পছন্দ থাকে, তো বল্, সম্বন্ধ করি।'

সোমনাথ দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল কোনও মেয়ের প্রতি তাহার পক্ষপাত নাই, কাহাকেও সে পর্যন্ত হৃদয় দান করে নাই। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; দিদি ও জামাইবাবু একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তারপর দিদি বলিলেন 'হ্যাঁরে, রত্নাকে তোর কেমন লাগে?'

নিঃসংশয় প্রশ্ন এবং ইহার পশ্চাতে একটা প্রস্তাব আছে। সোমনাথ আড় চোখে জামাইবাবুর পানে চাহিল; তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল দিদি তাহার অনুমোদন পাইয়াই প্রশ্ন করিয়াছেন।

সে কিছুক্ষণ নীরবে অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব ভোজন করিয়া সতর্কভাবে বলিল—'রত্না ভারি ভাল মেয়ে—বুদ্ধিমতী মেয়ে।' তাহার কথার সুরে মনে হইল বিবাহের প্রস্তাবের সহিত এই মন্তব্যের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চরিত্র সমালোচনা।

সোমনাথ আসল কথাটা এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া জামাইবাবু হাসিলেন—'রত্নাকে কি সোমনাথের পছন্দ হবে? ওর পেছনে এখন হুরী-পরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। রত্না তো কালো মেয়ে।'

দিদি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন—'কালো কেন হতে যাবে? রত্না উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।'

মহিলারা যাদের ভালবাসেন তাহারা কখনও কালো হয় না, সব উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

জামাইবাবু বলিলেন—'তবে আমিও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।'

দিদি রাগিয়া বলিলেন—'বাজে কথা বলো না, রত্না তোমার চেয়ে ঢের ফরসা। আর অমন মুখ চোখ ক'টা পাওয়া যায়? কিরে সোমু, বিয়ে করবি?'

সোমনাথ পূর্বে কখনও রত্নাকে নিজের বধূরূপে কল্পনা করে নাই; এখন কল্পনা করিয়া তাহার মনটি আনন্দে সরস হইয়া উঠিল। রত্না সুন্দরী নয় কিন্তু বধূরূপে সে পরম কমনীয়া। মনে মনে রত্নাকে চন্দনা দেবীর পাশে দাঁড় করাইয়া রত্নাকে মোটেই ছোট মনে হইল না।

দিদি আবার প্রশ্ন করিলেন—'কি বলিস, রাজি আছিস?'

বিবাহে অমত থাকিবার আর কোনও কারণ ছিল না, সে এখন পাঁচশত টাকা মাহিনা পাইতেছে। সোমনাথ সলজ্জ হাসিয়া বলিল—'আমি রাজি হলেই চলবে?'

দিদি বলিলেন—'না, রত্নারও মত নিতে হবে। তোর মতটা নিয়ে রাখলুম। আমার বিশ্বাস রত্না অমত করবে না।' বলিয়া ভ্রাতার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া হাসিলেন।

জামাইবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—আমাদের সময় এত মন-জানা-জানি ছিল না; থাকলে কী ভালই হ'ত!'

দিদি বলিলেন—'হ'তই তো।'

প্রাতরাশ শেষ করিয়া সোমনাথ ষ্টুডিও চলিয়া গেল। আজও আবার আউট-ডোর শূটিং আছে; ডুয়েট্ গান কাল শেষ হয় নাই।

আজ কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোনও হাঙ্গামা হইল না। জীবরাজ নাগর গাড়ীতে তাহাদের সহগামী হইলেন এবং ওকুস্থলে পৌঁছিয়া আকাশ সারাদিন এমন নির্মেঘ হইয়া রহিল যে বনের মধ্যে যাইবার কোনও সুযোগই হইল না। পূরা দিন সবেগে শূটিং চলিল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ দেখিল রত্না আসিয়াছে। বারান্দায় বসিয়া দিদি, রত্না ও জামাইবাবু গল্প করিতেছেন।

সোমনাথ রত্নাকে মাঝে বছর খানেক দেখে নাই। উনিশ বছর বয়সে রত্না আগের মতই ছোট খাটো আছে, কিন্তু বেশ গোলগাল হইয়াছে। মুখের সুডৌল দৃঢ়তার উপর যেন আর একটু লাবণ্যের আভা ফুটিয়াছে। সমতল অবঙ্কিম ভ্রূর নীচে চক্ষু দুটি আগের মতই শান্ত এবং অচপল। আর, দিদির কথাই ঠিক; রত্না কালো নয়, উজ্জ্বল হরিদ্রাভ শ্যামবর্ণ।

রত্না উঠিয়া সোমনাথকে প্রণাম করিল, সোমনাথ একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—'কেমন আছ?'

রত্না উত্তর না দিয়া সহজভাবে বলিল—'তুমি যে বম্বে চলে এসেছ

সে খবর আমরা বৌদির চিঠিতে পেলুম।'

কথার অন্তর্নিহিত বক্রোক্তিটা স্পষ্ট। রত্নারা কলিকাতায় থাকে সোমনাথও এতদিন কলিকাতায় ছিল, অথচ চলিয়া আসিবার আগে তাহাদের সঙ্গে দেখা করে নাই। সোমনাথ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—'হঠাৎ চলে আসতে হল—'

সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দিদি বাললেন—'রত্না, সোমুর চা-জলখাবার এখানেই আন্‌তে বল্।'

রত্না ভিতরে গিয়া নিজেই সোমনাথের খাদ্য পানীয় আনিয়া দিল। ভাবগতিক দেখিয়া সোমনাথ বুঝিল, প্রস্তাবিত বিবাহের কথা এখনও রত্নার কাছে উত্থাপিত হয় নাই, সোমনাথ বৌদিদির ভাই এই সম্পর্কে রত্না তাহার আদর যত্ন করিতেছে।

কিছুক্ষণ সাধারণ ভাবে বাক্যালাপ চলিবার পর রত্না সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—'নতুন কাজ লাগছে কেমন? বেশ মন বসছে তো?' তাহার গলার মধ্যে যেন ক্ষীণ ব্যঙ্গ লুকাইয়া আছে।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলিল—'লাগছে একরকম। আসল আকর্ষণ টাকা।' তারপর যাহাতে কথাটা আর বেশীদূর না গড়ায় (জামাইবাবু কি বলিয়া বসিবেন কিছুই বলা যায় না) তাই বলিল—'আই এ পাশ করে তুমি বি. এ. পড়বে তো?'

আগে পাশ তো করি।'

'পাশ তুমি করবেই। তারপর?'

দিদি বলিলেন—'তারপর বিয়ে, তারপর ঘর-সংসার। নে, তোকে আর ন্যাকামি করতে হবে না। ওর লেখাপড়ার পালা শেষ হয়েছে।'

রত্নার শান্ত চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল।

পরদিন পুরুষেরা কাজে বাহির হইয়া গেলে দিদি রত্নার কাছে কথা

পাড়িলেন। রত্না মন দিয়া শুনিল, হাঁ-না কিছু বলিল না ; তাহার মুখখানি আর একটু গম্ভীর হইল মাত্র।

দিদি উত্তরের জন্য জেদাজেদি করিলে সে বলিল—'আমায় একটু ভাববার সময় দাও।'

'এতে ভাববার কি আছে ? সোমুকে কি তোর পছন্দ নয় ?'

রত্না দিদির মুখের উপর চোখ পাতিয়া বলিল—'বৌদি, তুমি চাও ? সেজদা চান ?'

দিদি বলিলেন—'আমাদের চাওয়া-না-চাওয়ার কথা নয় রত্না! তোর চাওয়াটাই আসল।'

'তবে আমাকে একটু সময় দাও।'

এইখানে কথা মূলতুবি রহিল। দিদি নিরাশ হইলেন, কিন্তু আর চাপাচাপি করিতে পারিলেন না।

অতঃপর এক হপ্তা কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে সোমনাথের ভাগ্য লইয়া দুইটি নারীর মধ্যে অলক্ষ্যে যে দড়ি-টানাটানি চলিতেছে তাহার পূরা খবর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিলেন না। পাণ্ডুরঙ্ চন্দনা দেবীকে গভীর জলের মাছ বলিয়াছিল বটে কিন্তু রত্নার তুলনায় চন্দনা দেবী চুনোপুঁটি।

ষ্টুডিওতে শূটিং স্থগিত আছে, কাজ-কর্ম কিছু ঢিলা পড়িয়াছে। এমন মাঝে মাঝে হয় ; একটা সেটের কাজ শেষ হইবার পর নূতন সেট্ আরম্ভ হইবার ফাঁকে দু'চারদিন বিশ্রাম পাওয়া যায়। তখন কেবল ছুতার মিস্ত্রিদের খটাখট শব্দে ষ্টুডিও মুখরিত হইতে থাকে।

দ্বিপ্রহরে সোমনাথ নিজের ঘরের কৌচে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। হঠাৎ দ্বারে টোকা দিয়া যিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া সোমনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চন্দনা এ পর্যন্ত তাহার কক্ষে পদার্পণ করেন নাই; সোমনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্ভ্রমে

বলিল—'আসুন আসুন।'

চন্দনা দেবীর হাবভাব আজ অন্য রকমের, যেন একটু লজ্জিত ও জড়সড়। তিনি বলিলেন—'আপনাকে বিরক্ত করি নি তো? এক মিনিটের জন্য দরকার—'

'বিলক্ষণ—বসুন।'

চন্দনা একটি চেয়ারের প্রান্তে বসিলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন—'কাল আমার জন্মদিন। বাড়িতে সামান্য ডিনারের আয়োজন করেছি। আপনি আসতে পারবেন কি?'

সোমনাথ বিদ্যুদ্বেগে চিন্তা করিল। রাত্রে বাড়িতে নিমন্ত্রণ—নূতন ফাঁদ নয় তো? কিন্তু জন্মদিনের নিমন্ত্রণে অন্যান্য অতিথিও আসিবেন, পিলে সাহেবও অবশ্য উপস্থিত থাকিবেন; সুতরাং ভয়ের কারণ নাই।

সে হৃদ্যতা দেখাইয়া বলিল—'যাব বৈ কি, নিশ্চয় যাব।'

চন্দনা দেবী কৃতজ্ঞ হাসি হাসিলেন—'ধন্যবাদ। আমার বাড়ি কোথায় বোধহয় জানেন না। সহরের বাইরে বান্দ্রায় থাকি, একেবারে সমুদ্রের কিনারায়; কিন্তু আপনাকে বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে না, কাল রাত্রি আটটার সময় আমি বান্দ্রা ষ্টেশনে মোটর পাঠিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ।'

চন্দনা দেবী হাসিমুখে বিদায় লইলেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে সোমনাথের মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। সাবধানের মার নাই। তাছাড়া রত্না অবশ্যই জানিতে পারিবে। সে কি মনে করিবে কে জানে! হয় তো—

বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ আড়ালে জামাইবাবুকে নিমন্ত্রণের কথা

বলিল। জামাইবাবু বলিলেন—'কি আপদ, তুমি নেমন্তন্ন কাটিয়ে দিলে না কেন ?'

'এখন যদি কোনও ছুতো ক'রে—'

'এখন আর ভাল দেখাবে না, নেমন্তন্ন যখন স্বীকার করেছ তখন যেতে হবে। ভাল কথা, একটা কিছু উপহার নিয়ে যেও।'

উপহারের কথা সোমনাথের মনে নাই, সে বলিল—'আচ্ছা। তাহলে যাওয়াই স্থির ?'

জামাইবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ। তবে অন্য অতিথিদের সঙ্গে ফিরে এস, দেরী কোরো না। আর, যদি বিপদ হয় আমি তোমাকে রক্ষে করব—ভেবো না।'

জামাইবাবু কি করিয়া তাহাকে বিপদে রক্ষা করিবেন তাহা কিছু ভাঙিয়া বলিলেন না ; কিন্তু তাঁহার উপর সোমনাথের অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে আশ্বস্ত হইল।

পরদিন শনিবার ষ্টুডিওতে ছুটি। কারণ, যেদিন মহালক্ষ্মীর মাঠে ঘোড়দৌড় থাকে সেদিন কোনও ষ্টুডিওতেই ভাল করিয়া কাজ হয় না ; বেশীর ভাগ অভিনেতা অভিনেত্রীর একটা না একটা অসুখ হইয়া পড়ে, যাঁহারা দয়া করিয়া ষ্টুডিওতে আসেন তাঁহাদের মনও সারাদিন এমন উদভ্রান্ত হইয়া থাকে যে কোন কাজই হয় না। বুদ্ধিমান চিত্র-প্রণেতারা তাই রেসের মরসুমের কয় মাস শনিবারে ষ্টুডিও বন্ধ রাখেন।

সকালের দিকে সোমনাথ বাজারে গিয়া একটি রূপার ফুলদানী কিনিয়া আনিল, চন্দনা দেবীকে উপহার দিতে হইবে। তারপর সারাদিন সে বাড়িতে রহিল। রত্না আসার পর তাহার সারাদিন বাড়িতে থাকা এই প্রথম। রত্নার সহিত নানাসূত্রে তাহার অনেক-বার দেখা হইল কিন্তু রত্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কথা কহিল না ; সে

যেন নিজেকে নিজের মধ্যে বেশী করিয়া গুটাইয়া লইয়াছে। সোমনাথ বুঝিয়াছিল রত্না বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার মনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ তাহা সোমনাথ অনুমান করিতে পারে নাই। দিদিও কিছু বলেন নাই।

সন্ধ্যার পর সোমনাথ যখন সাজসজ্জা করিয়া রূপার ফুলদানীটি পকেটে পুরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল তখন রত্না একবার সপ্রশ্ন নেত্রে তাহার পানে তাকাইল। সোমনাথ কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানিত না। সোমনাথ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল— 'আচ্ছা দিদি, আমি তাহলে বেরুই। কখন ফিরব তা—'

দিদি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—'তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা জেগে থাকব।'

সোমনাথ চলিয়া গেলে রত্না তাহার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দিদির পানে ফিরাইল। দিদির পেটের মধ্যে অনেক কথা গজগজ করিতেছিল, আর চাপিয়া রাখা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি বলিলেন—'আয় রত্না, আমার ঘরে চল, তোর চুল বেঁধে দিই।

পাঁচ

সংস্কার এমনই জিনিষ যে অতি উগ্র জৈবধর্মকেও পোষ মানাইতে পারে। তাহা না হইলে সোমনাথ আজিকার দুর্নিবার প্রলোভন কখনই কাটাইয়া উঠিতে পারিত না। সংস্কারের প্রতি আজকাল আমরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে সংস্কারের পরিবর্তে এমন কিছুই পাই নাই যাহাকে দিশারী রূপে গ্রহণ করিতে পারি। বিজ্ঞান আমাদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র কাড়িয়া লইয়া হাতে আণবিক বোমা ধরাইয়া

দিয়াছে।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সোমনাথ চন্দনা দেবীর বাড়িতে গিয়া পৌঁছিল। বাগান-ঘেরা চমৎকার ছোট বাড়ি, সমুদ্রের বাতাস ও কল্লোলধ্বনি সর্বদা তাহাকে স্পন্দিত করিয়া রাখিয়াছে।

চন্দনা পরম সমাদরে সোমনাথকে ড্রয়িং রুমে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ড্রয়িং রুমে অন্য কোনও অতিথি নাই। সোমনাথ মনের অস্বস্তি এই বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিল যে সে নির্ধারিত সময়ের আগে আসিয়াছে, অন্য অতিথিরা এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।

আজ চন্দনা দেবীর বেশভূষা অতি লঘু এবং সংক্ষিপ্ত, কোনও আড়ম্বর নাই। সাবানের ফেনার মত অর্ধ স্বচ্ছ লেসের শাড়ী গায়ে জুড়িয়া আছে; ব্লাউজ নামমাত্র। অলঙ্কারের মধ্যে কানে দুইটি হীরার দুল এবং গলায় মুক্তার কণ্ঠি। নিটোল বাহু দুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ, শুধু অঙ্গুলির প্রান্তে নখের উপর কিউটেক্সের গভীর শোণিমা। পায়ে মখমলের নরম শ্লিপার। সোমনাথের মনে হইল, চন্দ্রালোকিত রাত্রে তাজমহলের উপর যদি সূক্ষ্ম কুজ্ঝটিকার আবরণ নামিয়া আসে তবে বুঝি এমনই দেখিতে হয়। তাজমহলের বয়স অনেক, কিন্তু সেজন্য তাহার সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। চন্দনার বয়স যদি সত্যই পঁয়ত্রিশ বৎসর হয় তাহাতেই বা কী ক্ষতি হইয়াছে? যৌবনের সহিত বয়সের সম্পর্ক কি?

সোমনাথ সলজ্জভাবে ফুলদানীটি পকেট হইতে বাহির করিল, মনে মনে যে বাঁধি-গৎ সাধিয়া রাখিয়াছিল তাহাই আবৃত্তি করিয়া বলিল —আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, আজকের এই দিনটি বারবার আপনার জীবনে ফিরে আসুক।'

চন্দনা দেবী এমন ভাবে ফুলদানীটি গ্রহণ করিলেন যেন উহা অমূল্য

নিধি। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—'কি বলে ধন্যবাদ জানাব? আপনার এই উপহারটিকে আশ্রয় করে আজকের রাত্রের স্মৃতি চিরদিন আমার মনে ফুলের মত ফুটে থাকবে।'

কবিত্বপূর্ণ এই অত্যুক্তিতে সোমনাথ অভিভূত হইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে এমন সময় একটি উর্দিপরা ভৃত্য ট্রে'র উপর দুটি পূর্ণ পানপাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। ভৃত্যটির মুখে কোনও ভাব নাই, সে বোবা-কালা। চন্দনা দেবী জীবনে যত সৎকার্য করিয়াছেন এই বোবা-কালা ভৃত্যটির নিয়োগ তাহার অন্যতম। সৎকার্য করিলেই পুণ্য ফল আছে; এই নির্বাক ভৃত্যটি তাঁহার একান্ত অনুগত, বাড়ির আভ্যন্তরিক যাবতীয় কাজ সে একাই করে এবং ঘরের কথা বাহির হইতে দেয় না।

ভৃত্যকে চন্দনা ইঙ্গিত করিতেই সে পানপাত্র দুইটি নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

সোমনাথ সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—'ওটা কি?'

চন্দনা একটি পানপাত্র তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—'কক্‌টেল—নিন।'

'সর্বনাশ! আমি তো মদ খাই না।'

চন্দনা তরল কৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'মদ নয়, ওতে একটু ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় মাত্র, নেশা হয় না। দেখুন না, আমিও খাব।'

অগত্যা সোমনাথ পাত্র হাতে লইল। চন্দনা দেবী নিজের পাত্রটি তাহার পাত্রে একবার ঠেকাইয়া তাহার চোখে চোখ রাখিয়া পাত্রে অধর স্পর্শ করিলেন। সোমনাথও নিজের পাত্রে চুমুক দিল, দেখিল শীতল পানীয় উপাদেয় বটে কিন্তু ঝাঁঝ আছে। ভয়ে ভয়ে সে বাকিটুকু শেষ করিয়া পাত্র রাখিয়া দিয়া বলিল—'আপনার অন্য অতিথিরা কৈ এখনও এলেন না?'

চন্দনা দেবী কুহককলিত কণ্ঠে বলিলেন—'অন্য অতিথি নেই, আপনিই একমাত্র অতিথি।'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল—'অ্যাঁ, আর মিঃ পিলে?'

চন্দনা দেবীর অধর প্রান্ত একটু প্রসারিত হইল, তিনি বলিলেন—'মিঃ পিলে বাড়িতেই আছেন। দেখবেন তাঁকে?'

সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়া চন্দনা সোমনাথকে বাড়ির এক কোণের একটি ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে মৃদুশক্তির আলো জ্বলিতেছে, টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল ও গেলাস; একটি কৌচের উপর পিলে সাহেব উন্মুলিত বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছেন। ঘরের বদ্ধ বাতাস মদের গন্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দনা দেবী পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীর গায়ে কয়েকবার নাড়া দিলেন কিন্তু পিলে সাহেব সাড়া দিলেন না, অনড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সোমনাথ দেখিল, চন্দনার মুখ নিবিড় বিতৃষ্ণায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সোমনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এটা নতুন কিছু নয়। প্রাত্যহিক ব্যাপার। আপনার বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে, চলুন এ নরক থেকে বাইরে যাই।'

সোমনাথ আবার ড্রয়িং রুমে আসিয়া বসিল। ককটেলের গুণে তাহার মাথার মধ্যে একটু রুমঝুম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পিলে সাহেবের অবস্থা দেখিয়া তাহার নেশা ছুটিয়া গেল। প্রতিভাবান মানুষ কি করিয়া নিজেকে এমন পশুতে পরিণত করিতে পারে? চন্দনা দেবীর জন্য তাহার অন্তর সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। যাহার স্বামী এমন অমানুষ সে যদি পতিব্রতা না হয়, দোষ কাহার?

চন্দনা দেবীও তার পাশে বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে ব্যথাবিদ্ধ

হাসি। সোমনাথের একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া তিনি করুণস্বরে বলিলেন—'আমার দাম্পত্য জীবন কেমন মধুর দেখলেন তো?'

সোমনাথ চন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'চন্দনা দেবী, আমি—আমি কি ব'লে আপনাকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না।—আপনি—'

'আমিও মানুষ, আমারও রক্ত মাংসের শরীর, এইটুকু যদি আপনি মনে রাখেন তাহলেই আমি ধন্য হব সোমনাথবাবু!'

চন্দনার মুখ দেখিয়া সোমনাথ সসঙ্কোচে তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রদান করিতে সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু যে উগ্র দাবী চন্দনার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সে পূরণ করিবে কি প্রকারে? তাহার অন্তর ছি ছি করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের মুখে এরূপ অভিব্যক্তি সে পূর্বে কখনও দেখে নাই।

চন্দনা তাহার দিকে চাহিয়া প্রজ্বলিত চক্ষে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় দূরের একটা ঘরে টিং টিং করিয়া ঘন্টি বাজিয়া উঠিল।

চন্দনার মুখের ভাব নিমেষে পরিবর্তিত হইল, ঘড়ির দিকে চকিতে দৃষ্টি হানিয়া তিনি অধরে একটু হাসি টানিয়া আনিলেন—'চলুন, ডিনারের সময় হয়েছে।'

ভোজন কক্ষে টেবিলের উপর দুজনের ডিনার সজ্জিত ছিল; সোমনাথ চন্দনার সহিত মুখোমুখি বসিল। বোবা-কালা ভৃত্য পরিবেশন করিল। সোমনাথ পূর্বে সাহেবী খানা খাওয়ার রীতি পদ্ধতি জানিত না, কিন্তু এ কয়মাস দিদির বাড়িতে থাকিয়া টেবিলের আদব কায়দা তাহার রপ্ত হইয়াছে, সে কোনও অসুবিধা বোধ করিল না।

আহারের প্রচুর আয়োজন ; একটির পর একটি আসিতেছে। ডিনার শেষ হইতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল।

চন্দনা টেবিল হইতে উঠিয়া ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। চন্দনা বলিলেন—'চলুন, ও ঘরে কফি দিয়েছে। আপনি আমার বাড়ি এখনও সবটা দেখেন নি। আসুন দেখাই।'

বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর চন্দনা আলো জ্বালিয়া দেখাইলেন ; গৃহকর্ত্রীর মহার্ঘ রুচি ও সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন প্রত্যেক ঘরেই বিদ্যমান। লাইব্রেরী ঘরটি সোমনাথের সবচেয়ে পছন্দ হইল ; সে লুব্ধ মনে ভাবিল, কবে তাহার এত টাকা হইবে যে নিজের বাড়ি এমনি ভাবে সাজাইতে পারিবে!

সর্বশেষে চন্দনা একটি ঘরের আলো জ্বালিয়া বলিলেন—'এটি আমার শোবার ঘর।'

সবুজ আলোতে ঘরটি স্বপ্নালু হইয়া আছে। খাটের উপর শুভ্র বিছানা যেন সংশয়ক্লান্ত মানুষকে সস্নেহে নিজের কোমল ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছে। সোমনাথ মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার চোখে যেন ঘোর লাগিয়া গেল।

সহসা সোমনাথ অনুভব করিল তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া চন্দনা তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'সোমনাথ!'

সোমনাথ মোহাক্রান্ত মনে অনুভব করিল, আর দুই দিক রক্ষা করিয়া চলিবার উপায় নাই ; হয় চন্দনাকে অপমান করিয়া প্রত্যাখান করিতে হইবে, নয় তো—

সে অস্ফুট স্বরে বলিল—'মিঃ পিলে ওঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন আমি ভুলতে পারছি না—'

এই কথার সূত্র কোথায় গিয়া শেষ হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বাধা পড়িল। অদূরে একটা ঘরে টিং টিং করিয়া ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। সোমনাথ যেন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল,—'কিসের ঘণ্টি বাজছে ?'

চন্দনা অধর দংশন করিলেন—'টেলিফোন।'

টেলিফোন বাজিয়াই চলিল। তখন চন্দনা শয়ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সোমনাথ তাঁহার অনুগমন করিল।

টেলিফোন তুলিয়া চন্দনা রুক্ষস্বরে বলিলেন—'হ্যালো!'

অপর প্রান্ত হইতে কি কথা আসিল সোমনাথ শুনিতে পাইল না। চন্দনা কিছুক্ষণ শুনিয়া বিস্মিত চক্ষু তাহার দিকে ফিরাইলেন।

'আপনাকে কে ডাকছে।'

সোমনাথ গিয়া ফোন ধরিল—'হ্যালো!'

জামাইবাবু বলিলেন—'কি হে খবর কি ? কেমন আছ ?'

জামাইবাবুর কণ্ঠস্বর সোমনাথের কর্ণে সুধাবৃষ্টি করিল। সে একবার আড়চোখে চন্দনার প্রতি চাহিয়া বাংলা ভাষায় বলিল—'ভাল নয়।'

'তাহলে শীগ্‌গির চলে এস। আমার ভয়ানক অসুখ করেছে, বাড়িতে ডাক্তার ডাকবার লোক নেই। আর দেরী কোরো না, বুঝলে ?'

সোমনাথ বুঝিল। টেলিফোন রাখিয়া দিয়া সে অত্যন্ত বিপন্নভাবে চন্দনার দিকে ফিরিল—'আমাকে এখনি যেতে হবে। আমার আত্মীয়—যাঁর বাড়িতে আমি থাকি—তাঁর হঠাৎ অসুখ করেছে, ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন—' মুক্তির আশায় সোমনাথ কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিল।

চন্দনার মুখখানা একেবারে শাদা হয়ে গেল। তিনি আবার অধর

দংশন করিয়া বলিলেন—'কফি খেয়ে যাবেন না?'
'মাফ্ করবেন, আর এক মিনিট দেরী করা চলবে না। আমি না গেলে ডাক্তার ডাকা পর্যন্ত হবে না। অনুমতি দিন।'

ট্রেণে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সোমনাথের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। মুক্তি সে পাইয়াছে বটে কিন্তু সমস্যা যেন আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বাড়িখানা বারবার তাহার মানস-চক্ষু ভাসিয়া উঠিল। অনবদ্য রসবোধের দ্বারা সজ্জিত একটি সুখের নীড়; তাহাতে একটা মাতাল অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। আর, একটি স্ত্রীলোক—, স্ত্রীলোকটি কি করিতেছে? চন্দনা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু সোমনাথ তাহাকে অন্তর হইতে ঘৃণা করিতে পারিল না। হয়তো ইহা তাহার পুরুষোচিত দুর্বলতা; পুরুষ যে-নারীর ভালবাসা পাইয়াছে—তা সে ভালবাসা যতই নিকৃষ্ট হোক—তাহাকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারে না। বেদনার সহিত সোমনাথের মনে হইল, ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে চন্দনা হয়তো এমন মন্দ হইত না।
বাড়ি পৌঁছিয়া সোমনাথের মন আবার শান্ত হইয়া গেল। এ বাড়ির আবহাওয়া যেন একেবারে ভিন্ন, এখানে দিদি আছেন—রত্না আছে—! মুক্তির আনন্দ তাহাকে নূতন করিয়া পুলকিত করিয়া দিল।
দিদি এবং জামাইবাবু ড্রইং রুমে ছিলেন, রত্না শয়ন করিতে চলিয়া গিয়াছিল। সোমনাথ আসিয়া ভক্তিভরে জামাইবাবুর পদধূলি লইল। জামাইবাবু হাসিয়া উঠিলেন—'যাক, ঠিক সময় উদ্ধার করেছি তাহলে!'
দিদি কিন্তু হাসিলেন না, বলিলেন—'হাসির কথা নয়। সোমু, কি

হয়েছে সব খুলে বল্, লজ্জা করিস নি।'

বিশদ ব্যাখ্যা করিবার বিষয় নয়, তবু সোমনাথ লজ্জা চাপিয়া যথাসাধ্য খোলসা করিয়া বলিল।

শুনিয়া দিদি বলিলেন—'না, এ সব ভাল কথা নয়। কথায় বলে মন না মতি। তুই এ কাজ ছেড়ে দে।'

সোমনাথ বলিল—'কণ্ট্রাক্ট আছে, ছবি শেষ না হলে ছাড়ব কি করে। ওদিকে ব্যাঙ্কের কাজও ছেড়ে দিয়েছি—'

দিদি স্বামীকে বলিলেন—'তাহলে তুমি বাপু যাহোক কর।'

জামাইবাবু বলিলেন—'বেশ যাহোক, তোমার সুন্দর ভাই জট পাকাবে আর আমি জট ছাড়াব!'

দিদি বলিলেন—ওর দোষ কি? সব দোষ ঐ বজ্জাত মেয়েমানুষটার।'

জামাইবাবু বলিলেন—'তবু ভাল, মেয়েমানুষের দোষ দেখতে পেলে। যাহোক, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সোমনাথ, তুমি যে অবিবাহিত একথা মহিলাটি জানেন?'

'বলতে পারি না—কখনও কথা হয় নি।'

'হুঁ। তিনি ঠিক বুঝেছেন তুমি কুমার ব্রহ্মচারী, তাই তোমার তপোভঙ্গ করবার এত আগ্রহ। এখন, তাঁকে যদি কোনও রকমে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তুমি বিবাহিত, তোমার ঘরে একটি প্রেমময়ী ভার্যা আছেন, তাহলে তিনি হয়তো তাঁর মোহিনী মায়া সম্বরণ করিতে পারেন।'

দিদি বলিলেন—'বেশ তো সোমু, তুই কালই কথায় কথায় ওকে বল্‌না যে তোর বিয়ে হয়েছে—'

সোমনাথ দ্বিধাভরে বলিল—'এতদিন বলি নি, এখন বললে কি—'

জামাইবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'কোনও কাজই হবে না। একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ হাজির করতে হবে, নইলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। শোনো, মহিলাটি সোমনাথকে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিলেন, সোমনাথ তার পাল্‌টা দিক, মহিলাটিকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসুক—তারপর বৌ দেখিয়ে দিক—'

বিদ্যুৎ চমকের মত সোমনাথ বুঝিতে পারিল জামাইবাবুর গূঢ় অভিপ্রায় কি ; কিন্তু দিদি অত সহজে বুঝিলেন না, বলিলেন—'কি আবল তাবল বলছ ? বৌ কোথায় যে দেখিয়ে দেবে।'

জামাইবাবু হৃদয়ভরাক্রান্ত একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের উপর চিৎ হইয়া কড়ি বরগা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সোমনাথ অপ্রতিভ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি কিছু জানি না। দিদি, তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি শুতে চললুম।'

সোমনাথ পলায়ন করিল। দিদি এতক্ষণে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিলেন—'হ্যাঁ গা, কি বলছ স্পষ্ট করে বল না। রত্না—?'

জামাইবাবু ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দিলেন—'রত্না যদি একদিনের জন্যে বৌ সাজতে রাজি থাকে আমার আপত্তি নেই। ছোঁড়াকে কোনও রকমে বাঁচাতে হবে তো ?'

দিদি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'রত্না কি রাজি হবে ? ওকে কোনও কথা বলতে আমার সঙ্কোচ হয়। বিয়ের কথায় ভাববার সময় দাও ব'লে সময় চাইলে, তারপর তো কিছুই বলে নি—'

জামাইবাবু ঊর্ধ্ব হইতে দৃষ্টি নামাইয়া বলিলেন—'বলে গ্যাখো যদি রাজি হয়। আর এ কথাটাও রত্নাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে সোমনাথের মত স্বামী পাওয়া যে-কোনও মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের

কথা।'

দিদি বলিলেন—'ও কথা আমি তাকে বলতে পারব না, বলতে হয় তুমি বোলো। তবে এক রাত্রির জন্যে বৌ সাজতে ব'লে দেখতে পারি। যদি রাজি হয় খুব মজা হয় কিন্তু।'

দিদির প্রাণে এখনও রোমান্সের রঙের খেলা মুছিয়া যায় নাই, জামাইবাবু তো বর্ণচোরা আম। তিনি একটা হাই তুলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—'আমারও ঘুম পাচ্ছে।'

দিদি ঘড়ি দেখিলেন, পৌনে বারোটা, তিনি বলিলেন—'তুমি শোও গে, আমি আসছি।' এত রাত্রে কি রত্না জাগিয়া আছে? যদি জাগিয়া থাকে আজ রাত্রেই কথাটার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা ভাল।

রত্নার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দিদি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রত্না সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে এবং অলস-হস্তে খোঁপা খুলিতেছে। তাহার চুল খুলিয়া শোয়া অভ্যাস, খোঁপা বাঁধা অবস্থায় সে ঘুমাইতে পারে না।

দিদি বলিলেন—'ওমা, তুই এখনো ঘুমোস নি?'

রত্না বলিল—'এই শুতে যাচ্ছি।'

দিদি রত্নার বিছানায় বসিয়া বলিলেন—'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে রত্না—'

রত্না বলিল—'কথা আমি সব শুনেছি।'

দিদি গালে হা'ত দিলেন—'অ্যাঁ, কি করে শুন্‌লি? আড়ি পেতেছিলি নাকি?'

রত্না শান্ত স্বরে বলিল—'আড়ি পাতবার দরকার হয় নি। এ বাড়িতে রাত্তির বেলা ফিস্ ফিস্ করে কথা কইলেও শোনা যায়। আমি তো রোজ রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমাদের নাক

ডাকার শব্দ শুনি।'

'শুনেছিস্ তাহলে? ভালই হল। তা কি বলিস্?'

দ্রুত অঙ্গুলি দ্বারা চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে রত্না চোখ না তুলিয়াই বলিল—'মেজদার যখন হচ্ছে তখন তাই হবে, কিন্তু এসব আমার ভাল লাগে না।'

ছয়

টেলিফোনে সোমনাথ চন্দনা দেবীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিল। বলিল—'অসভ্যর মত ডিনার শেষ হবার আগেই চলে এসেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করতে পারছেন কি?'

চন্দনা দেবী সোমনাথের গলা শুনিয়া প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'আপনার আত্মীয় কেমন আছেন?'

সোমনাথ যেখানে বসিয়া টেলিফোন করিতেছিল, জামাইবাবু তাহার অদূরে বসিয়াছিলেন, সোমনাথ তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল—'আমার আত্মীয়ের মৃগী রোগ আছে, জানতাম না। হঠাৎ আক্রমণ হয়। উপস্থিত ভাল আছেন।'

জামাইবাবু শ্যালকের উদ্দেশে মুখ বিকৃত করিলেন।

সোমনাথ টেলিফোনে বলিল—'আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আপনাকে আসতে হবে—অসমাপ্ত ডিনার সম্পূর্ণ করার জন্যে। আসবেন কি?'

চন্দনার কণ্ঠস্বর এতক্ষণ অপেক্ষাকৃত নিরুৎসুক ছিল, এখন তাহা আগ্রহে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'আপনি কি আমাকে ডিনারের নেমন্তন্ন করছেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে আর মিঃ পিলেকে।'

চন্দনা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'মিঃ পিলেকে তো আপনি দেখেছেন। সন্ধ্যের পর তিনি—'

'তবে আপনি একাই আসুন।'

চন্দনার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, সুযোগ হারাইয়া সোমনাথ পস্তাইতেছে—তাই—। তবু নিশ্চয় হওয়া ভাল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আর কাকে নেমন্তন্ন করলেন?'

সোমনাথ বলিল—'আর কেউ না। আসবেন তো?'

চন্দনা গদগদ স্বরে বলিলেন—'আসব।'

'ধন্যবাদ—অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলিয়া সোমনাথ চন্দনাকে নিজের ঠিকানা দিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দিদি রত্নাকে সাজাইতে বসিলেন। জাফরাণ রঙের নূতন বেনারসী শাড়ী আজই দিদি কিনিয়া আনিয়াছেন, তাহাই পরাইয়া, চুলে অশোক ফুলের বেণী জড়াইয়া, সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন; মুখখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কোমল হাসিলেন—'সিঁদুর প'রে কি মিষ্টি যে তোকে দেখাচ্ছে রত্না! কিন্তু তুই মন শক্ত করে রাখিস্ নি।' মনে ক'র না একটা খেলা।'

'তাই মনে করবার চেষ্টাই তো করছি বৌদি, কিন্তু পারছি কৈ?'

'কেন পারবি না! মনটাকে একটু হাল্কা কর, নরম কর, তাহলেই পারবি।'

'তুমি তো জানো কি বিচ্ছিরি প্যাঁচালো আমার মন।'

'বালাই ষাট্, তোর মন বিচ্ছিরি প্যাঁচালো হতে যাবে কেন? তোর গঙ্গাজলের মতন মন।' বলিয়া দিদি সস্নেহে তাহার গণ্ডে

চুম্বন করিলেন। রত্নার চোখ একটু ছলছল করিল।

দিদি বলিলেন—'কিন্তু মনে থাকে যেন, শুধু বৌ সাজলেই হবে না, বৌয়ের মত অভিনয় করা চাই। নৈলে সব ভেস্তে যাবে।'

'কি করব বলে দাও।'

'কি আর করবি, লজ্জা লজ্জা ভাবে ওর সঙ্গে কথা কইবি, কাছে ঘেঁসে দাঁড়াবি—মোট কথা ও যে তোর জিনিষ তা যেন বেশ বোঝা যায়। খুব শক্ত হবে না—দেখিস্ তখন।' দিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় চন্দনা দেবীর মোটর আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। সোমনাথ নিজে গিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইল। আজ চন্দনার বেশভূষা সম্পূর্ণ অন্য রকমের—আগাগোড়া লালে লাল। যেন সর্বাঙ্গে অনুরাগের ফাগ মাখিয়া তিনি অভিসারে আসিয়াছেন।

ড্রয়িং রুমের দ্বারে পৌঁছিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; ড্রয়িং রুমে লোক থাকিবে তিনি কল্পনা করেন নাই। আজ চন্দনা দেবী মনে অনেক আশা লইয়া আসিয়াছিলেন। নির্জন গৃহে দুইটি নর-নারীর নিভৃত নৈশ আহার—তারপর অজানা পরিবেশের মধ্যে নূতনের আস্বাদ—

সোমনাথ মৃদুকণ্ঠে পরিচয় করাইয়া দিল—'ইনি আমার দিদি, ইনি জামাইবাবু, আর ইনি—'সোমনাথ সলজ্জ হাস্যে ঘাড় হেঁট করিল।

পূর্ণ এক মিনিট পরে চন্দনা দেবী কথা কহিলেন; তাঁর মুখের একটি অল্পকথায় হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুই করতল যুক্ত করিয়া সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—'আজ আমার আশ্চর্য হবার দিন। সোমনাথবাবু যে এমন ভাগ্যবান পুরুষ তা আমাকে

জানান নি।'

সোমনাথ বলিল—'উপলক্ষ্য হয় নি তাই বলি নি—'

জামাইবাবু বলিলেন—'সোমনাথ ভারি চালাক ছোকরা; মেয়ে মহলে পাছে কদর কমে যায় তাই বিয়ের কথা কাউকে বলতে চায় না।'

সকলে উপবিষ্ট হইলেন। চন্দনা বলিলেন—'সোমনাথবাবু যদি এত স্বার্থপর না হতেন তা হলে আপনাদের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমার আগেই হত।'

ক্ষণকালের জন্য একটা কেলেঙ্কারীর আশঙ্কা সোমনাথের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছিল, কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত হইল। চন্দনা দেবী প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াছেন, এখন আর সুনিপুণা অভিনেত্রীর অভিনয়ে কেহ খুঁৎ ধরিতে পারিবে না।

কিন্তু তবু দুই পক্ষের মনেই যেখানে গলদ আছে সেখানে আলাপের ধারা খুব স্বচ্ছন্দ হয় না; এইখানে জামাইবাবু অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইলেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্য বাক্যালাপের গতি শ্লথ হইতে দিলেন না, গল্প রসিকতা ফষ্টিনষ্টি করিয়া আসর জমাইয়া রাখিলেন। জামাইবাবু যে এতটা মজলিসি লোক সে পরিচয় সোমনাথ পূর্বে পায় নাই।

সোমনাথ ও রত্না পাশাপাশি একটি কৌচে বসিয়াছিল, কোনও প্রকার বাড়াবাড়ি না করিয়া দু'জনে নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। সোমনাথের যদি অভিনয়ের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, রত্নার কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবু উভয়ের মধ্যে রত্নাই বোধহয় সহজ অভিনয় করিতেছিল। সোমনাথের একটু আড়ষ্টতা মাঝে মাঝে তাহাকে আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিতেছিল।

জামাইবাবুর বাক্‌চাতুরী শুনিতে শুনিতে চন্দনা তাঁহার অর্ধ-নিমীলিত নেত্র তাহাদের পানে ফিরাইতেছিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না; কিন্তু ঐ মদভঙ্গুর দৃষ্টি রত্না ও সোমনাথকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। রত্না তখন যেন নিজের পত্নীত্ব ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সোমনাথের দিকে ঘেঁষিয়া বসিতেছিল।

জামাইবাবুর বাক্যস্রোতের বিরামস্থলে চন্দনা দেবী একবার বলিলেন—'সোমনাথবাবু, আপনার স্ত্রীকে সিনেমায় নামান না কেন? আমার বিশ্বাস উনি অভিনয় করলে বেশ নাম করতে পারবেন।'

সোমনাথ ইতস্তত করিয়া বলিল—'অভিনয়ে ওঁর রুচি নেই।'

চন্দনা তখন রত্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্যিই আপনার অভিনয়ে রুচি নেই?'

রত্না একটু মুখ টিপিয়া থাকিয়া বলিল,—'অভিনয় দেখতে বেশ লাগে কিন্তু অভিনয় করবার প্রতিভা আমার নেই।'

চন্দনা একটু হাসিলেন।

যথাসময়ে সকলে ডিনার টেবিলে গিয়া বসিলেন। এখানেও গৃহস্থের পক্ষ হইতে গৃহস্বামীই আসর সরগরম করিয়া রাখিলেন। চন্দনা দেবীরও ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি এই নিমন্ত্রণ খুব উপভোগ করিতেছেন। জামাইবাবুর চটুলতায় তাঁহার কলহাস্য থাকিয়া থাকিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

ডিনার শেষে ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিয়া চন্দনা আর বসিতে চাহিলেন না। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, তিনি মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আমি এবার যাব, অনেক দূর যেতে হবে। আপনাদের আতিথ্যের জন্যে অসংখ্য

ধন্যবাদ, আপনাদের সংসর্গে এসে অনেক নতুন আলো দেখতে পেয়েছি—'তাহার মুখের হাসি ক্রমে চোখা অম্লরসে ভরিয়া উঠিল, তিনি সোমনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনাকে আর ধন্যবাদ দেব না, শুধু বন্ধুভাবে সাবধান করে দিই। যার ঘরে নব-পরিণীতা বধূ তার কিন্তু বাইরের দিকে মন যাওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, গুড্ নাইট্।

এইভাবে পরিহাসচ্ছলে বিষোদ্গার করিয়া চন্দনা বিদায় লইলেন।

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে নীরবে আহার সম্পন্ন হইতেছিল। জামাইবাবু খবরের কাগজে চোখ বুলাইতেছিলেন; সোমনাথ আহার শেষ করিয়া উঠি-উঠি করিতেছিল, আজ তাহাকে ন'টার মধ্যে ষ্টুডিও পৌঁছিতে হইবে কারণ আবার পূরা দমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ রত্না বলিল—'মেজদা, আমি কলকাতায় ফিরে যাব, ব্যবস্থা করে দাও।'

জামাইবাবু ভ্রূ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন; রত্না বলিল—'এখানে আর আমার মন টিকছে না, পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় হল—'

জামাইবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'বেশ, অফিসে গিয়ে টিকিটের চেষ্টা করব। যদি পাওয়া যায় ফোনে তোমাকে জানাব, তুমি তৈরী হয়ে থেকো।' বলিয়া অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।

কাল চন্দনা চলিয়া যাইবার পর বাড়ির সকলের মনের উপর যে অনির্দিষ্ট অস্বচ্ছন্দতা নামিয়া আসিয়াছিল এখন যেন তাহা আরও পীড়া-দায়ক হইয়া উঠিল। কী যেন সহজেই হইতে পারিত অথচ

হইল না; সোমনাথ মনের মধ্যে একটা চাপা ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সে নিঃশব্দে ষ্টুডিও চলিয়া গেল।

ষ্টুডিওতে সারাদিন কাজ চলিল। ভাগ্যক্রমে চন্দনা দেবীর আজ কাজ ছিল না, তাঁহার সহিত দেখা হইল না। বৈকালের দিকে মিঃ পিলে তাহাকে অফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সোমনাথের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। গত কয়েকদিন যাবৎ সে পিলে সাহেব সম্বন্ধে একটা অহেতুক সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল; যদিও তাহার কোনই দোষ ছিল না তবু সে সহজভাবে পিলে সাহেবের সম্মুখীন হইতে পারিতেছিল না।

অফিসে উপস্থিত হইলে পিলে সাহেব কিন্তু তাহার সহিত কাজের কথাই বলিলেন। একটা দৃশ্যে সোমনাথের অভিনয় কিছু নিরেশ হইয়াছিল, সেই দৃশ্যটি রি-টেক করিতে হইবে। কি ভাবে সোমনাথ দৃশ্যে অভিনয় করিবে পিলে সাহেব তাহা নূতন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অফিস ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সোমনাথ দ্বারের নিকট একবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিল পিলে সাহেব রক্তাক্ত তির্যক চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছেন; দৃষ্টিতে যেন বিষ মেশানো। চোখাচোখি হইতেই তি[illegible] চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

সোমনাথের মন আবার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেহ কি তাঁহাকে কিছু বলিয়াছে? কিন্তু কি বলিবে? বলিবার আছে কি?

বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ দেখিল, রত্নার সুটকেশ ও হোল্‌ডল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিরাজ করিতেছে। টিকিট পাওয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।

রত্না বলিল—'চল তোমাকে খেতে দিই। বৌদির মাথা ধরেছে,

শুয়ে আছেন।'

খাবার ঘরে রত্না সোমনাথকে চা জলখাবার দিল। খাইতে খাইতে সোমনাথ বলিল—'রত্না, ঐ ব্যাপারের জন্যেই কি তুমি হঠাৎ চলে যাচ্ছ?'

রত্না চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ বলিল—'তোমার যাবার দরকার ছিল না। আমিই এ বাড়িতে বাইরের লোক, যেতে হলে আমারই যাওয়া উচিত।'

রত্না বলিল—'সে কথা নয়, আমিই চলে যেতে চাই। তোমাকে উদ্ধার করা তো হয়ে গেছে এখন আমি গেলেই বা ক্ষতি কি?' বলিয়া একটু হাসিল।

সোমনাথ বলিল—'চন্দনা যাবার সময় যে-কথা বলে গেল তা কি তুমি বিশ্বাস করেছ?'

'না। ওটা শুধু প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা।'

সোমনাথ রত্নার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল কিছু বোঝা যায় না। রত্নার মুখ দেখিয়া কিছুই বোঝা যায় না কেন? সোমনাথ একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমার জন্যে তোমার বোম্বাই বেড়ানোটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

রত্না বলিল—'ও কথা থাক। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। তুমি বোধ হয় দু'এক বছরের মধ্যে কলকাতায় যেতে পারবে না। যখন যাবে তখন হয় তো আমি কলকাতায় থাকব না।'

'থাকবে না কেন?'

রত্না এবার একটু জোর করিয়া হাসিল—'শোনো কথা। মেয়ে কি চিরদিন বাপের বাড়ি থাকে? কোথায় চলে যাব তার ঠিক কি?'

সোমনাথের মুখে আর কথা যোগাইল না। দিদি যে প্রস্তাব

করিয়াছিলেন ইহা তাহারই জবাব। রত্না অস্পষ্ট কিছু রাখিয়া যাইতে চায় না, চলিয়া যাইবার আগে কাটা-ছেঁড়া জবাব দিয়া যাইতে চায়।

বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। জামাইবাবু আসিয়া রত্নাকে বলিলেন—'তৈরি আছো? তাহলে আর দেরী নয়। ঠিক আটটায় ট্রেণ!'

রত্না চলিয়া যাইবার পর ঠিক একমাস পরে সোমনাথের ছবি শেষ হইল। এই একমাসের মধ্যে চন্দনা দেবীর সহিত অনেকবার দেখা হইয়াছে, কিন্তু চন্দনা দেবীর ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। সোমনাথের উপর আর কোনও নূতন চেষ্টা হয় নাই, চন্দনা দেবী নিশ্চয়রূপে তাহার আশা ছাড়িয়াছেন। জামাইবাবু ভাল বুদ্ধি বাহির করিয়াছিলেন। সবচেয়ে সুখের বিষয় চন্দনা রাগ করিয়া থাকেন নাই। যাহার সহিত সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিতে হইবে তাহার সহিত প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিলে কাজ করিয়া সুখ থাকে না। বিশেষত এই একটি ছবিতে কাজ করিয়া সোমনাথ বুঝিয়াছিল অভিনয়ে তাহার সত্যকার যোগ্যতা আছে, এ কাজ সে ভাল ভাবেই করিতে পারিবে।

যাহোক সোমনাথের প্রথম ছবি শেষ হইল।

ছবির শেষ শট্ লওয়া হইয়া গেলে পিলে সাহেবের সেক্রেটারি সোমনাথের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর মুখে বলিল—'মিঃ পিলে আফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবেন না।'

চন্দনা দেবী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। সোমনাথ তাঁহার দিকে ফিরিতেই তিনি হঠাৎ পিছু

ফিরিয়া নাগরজীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন।

সোমনাথ কিছু বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ ষ্টুডিওর আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি মুখের রং ধুইয়া পিলে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

পিলে সাহেব নিজের ঘরে বসিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া সোমনাথ চমকিয়া উঠিল; সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ক্রোধের ফুল্‌কি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। তিনি সোমনাথের পানে চাহিলেন, মনে হইল রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতেছে।

সোমনাথ টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি তাহার সম্মুখে একখণ্ড কাগজ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'এই নাও তোমার ছাড়পত্র। তোমাকে আর আমার দরকার নেই।'

সোমনাথ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল।

'আমাকে আর দরকার নেই?'

পিলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'না। তোমাকে আমি ভদ্রলোক মনে করেছিলাম কিন্তু দেখছি তুমি জঘন্য চরিত্রের লোক। অসভ্য—বর্বর—'

দৃঢ়ভাবে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সোমনাথ বলিল—'আমার নামে আপনি কী শুনেছেন বলবেন কি?'

'তোমার যদি একতিল লজ্জা থাকত তাহলে একথা জিজ্ঞাসা করতে না। আমার স্ত্রীকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছিলে, প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিলে। দুশ্চরিত্র স্কাউণ্ড্রেল।'

'এ কথা কে আপনাকে বলেছে?'

'কে বলেছে? যাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিলে সেই

বলেছে। যাও—বেরোও এখনি আমার ষ্টুডিও থেকে—
চন্দনা দেবী বলিয়াছেন। তাহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া নিজের চরিত্র ঢাকা দিয়াছেন। ইহাই বুঝি তাঁহাদের রীতি। সোমনাথের ইচ্ছা হইল, চন্দনার সমস্ত ছলাকলার ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া কে প্রকৃত অপরাধী তাহা পিলে সাহেবকে জানাইয়া দেয়; কিন্তু তাহাতে কী লাভ হইবে? পিলে সাহেব বিশ্বাস করিবেন না, শুধু এই কদর্য কলহ আরও ক্লেদ পঙ্কিল হইয়া উঠিবে।

'আচ্ছা আমি যাচ্ছি। নমস্কার।'

পিলে সাহেব প্রতি নমস্কার করিলেন না, তর্জনী তুলিয়া দ্বারের দিকে নির্দেশ করিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সোমনাথ দেখিল, পর্দাঢাকা দ্বারের পাশ হইতে একটা চওড়া শাড়ীর পাড় চকিতে সরিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে

এক

সোমনাথ অগাধ জলে পড়িল। যে কাজের স্থায়িত্বের ভরসায় সে ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাও গেল। এখন সে কী করিবে, কোথায় যাইবে? সোমনাথের মনে হইল, অদৃষ্ট তাহাকে লইয়া নিষ্ঠুর পরিহাস করিয়াছে, যে অবলম্বনের উপর ভর করিয়া সে ভাসিয়া ছিল, তাহা ভুলাইয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তীরে লইয়া যাইবার ছলে গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়াছে।

দিদি বলিলেন—'তুই অত মনমরা হচ্ছিস কেন? ও চাকরি গেছে ভালই হয়েছে। আরও কত সিনেমা কোম্পানী আছে, খবর পেলে তোকে লুফে নেবে।'

সোমনাথ কিন্তু ভরসা পাইল না। এখানে আসিয়া অবধি সে পিলে সাহেবের ষ্টুডিওতেই দিন যাপন করিতেছে, অন্য কোনও সিনেমা কোম্পানীর খোঁজ খবর রাখে নাই, কাহারও সহিত মুখ চেনাচেনি পর্যন্ত নাই। কে তাহাকে কাজ দিবে? সে-ই বা কোন্ মুখে অপরিচিতের কাছে উমেদার হইয়া দাঁড়াইবে? আর, কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে দিদির বাড়িতেই বা কতদিন নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিবে? তার চেয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যা-হোক একটা চেষ্টা করা ভাল। হয় তো চেষ্টা করিলে ব্যাঙ্কের কাজটা আবার পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপে নানা সংশয়ময় দুশ্চিন্তায় হপ্তাখানেক কাটিয়া যাইবার পর একদিন বৈকালে পাণ্ডুরঙ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভর্ৎসনা

করিয়া বলিল—'বা দোস্ত, তুমি এখানে ছিপে রুস্তম হয়ে বসে আছ, আর আমি হাম্বারব ক'রে তোমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আহ্লাদে সোমনাথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম ভাই। কোত্থেকে আমার ঠিকানা পেলে?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'কেউ কি তোমার ঠিকানা বলে? যাকে জিগ্যেস করি সেই গুম হয়ে যায়। শেষে এক মতলব বের করলাম; ফাউণ্টেন পেনের সেক্রেটারিকে বললাম, তুমি আমার কাছে টাকা ধার করে কেটে পড়েছ। তখন ঠিকানা পাওয়া গেল। যা হোক, পিলে তোমাকে বিল্বপত্র শুঁকিয়েছে জানি। এখন সব কেচ্ছা খুলে বল।'

সোমনাথ তখন সেই আউট-ডোর শূটিং-এর দিন হইতে আগাগোড়া কাহিনী শুনাইল। পাণ্ডুরঙ্ ঘোর বাস্তবপন্থী লোক সে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'ভুল করেছ বন্ধু, দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেই ভাল করতে। তাতে চাকরী যেত না, বরং উন্নতি হ'ত।'

সোমনাথ বলিল—'সে আমার দ্বারা হ'ত না পাণ্ডুরঙ্। তার চেয়ে চাকরি গেছে, মাথায় মিথ্যে কলঙ্ক চেপেছে এ বরং ভাল।'

পাণ্ডুরঙ্ একটু ম্লান হাসিল—'তুমি যে সুযোগ হেলায় ছেড়ে দিলে সেই সুযোগ পাবার জন্যে অনেক মিঞা জান্ কবুল করত। যেমন আমি; কিন্তু আমার পাথর-চাপা কপাল; আমাকে দেখলে দেবীদের হাসি পায়, প্রেম পায় না; কিন্তু সে যাক, এখন কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করি নি, চুপ করে বসে আছি।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। চল, আমার জানা

কয়েকজন প্রাডিউসার আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। তোমার চেহারা আছে, কাজ জুটে যাবেই।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ পাণ্ডুরঙের দিকে চাহিয়া রহিল—'তুমি প্রকাশ্য-ভাবে আমাকে সাহায্য করলে তোমার অনিষ্ট হবে না? পিলে সাহেব বা চন্দনা দেবী যদি জানতে পারেন—'

'জানতে তারা পারবেই, কারণ সিনেমার রাজ্যে হরদম রেডিও চলছে, কে কি করছে কিছুই অজানা থাকে না।'

'তবে? তুমি তাদের চাকরি কর—'

'চাকরি করি তো কী? আমার বন্ধুর বিপদের সময় তাকে সাহায্য করব না? এই যদি চাকরির সর্ত হয় তাহলে ঝাড়ু মারি আমি চাকরির মুখে।'

সোমনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে—আমাকে সাহায্য করলে তোমার চাকরি যাবে পাণ্ডুরঙ্।'

পাণ্ডুরঙ্ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—'ভাই, আমি সতেরো বছর বয়স থেকে সিনেমা করছি, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি—আবার না হয় নতুন ঘাটের জল খাব। তাতে বান্দা ভয় পায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পিলের ষ্টুডিওতে সুখে আছি, লোকটা ছবি তৈরি করতে জানে; কিন্তু তাই বলে আমি তার কেনা গোলাম নই। নাও, চল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক, সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে আর প্রডিউসার সাহেবদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?'

'তাঁরা তখন গুপ্ত বেহেস্তে গা ঢাকা দেন। সব প্রডিউসারের একটি করে গোপন বেহেস্ত আছে কিনা; কিন্তু তুমি সাধু সন্ন্যিসি মানুষ, এ সব বুঝবে না।'

দুই বন্ধু বাহির হইল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'একটা ট্যাক্সি ধরা যাক্।'

সোমনাথ বলিল—'কেন, ট্রামে-বাসে যাওয়া চলবে না?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ভাই সোমনাথ, তোমাকে একটা উপদেশ দিই, মনে রেখো। সিনেমার বড় সাহেবদের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবে, ট্যাক্সিতে যাবে; নৈলে কদর থাকবে না।'

'তুমি বুঝি ট্যাক্সি ছাড়া চল না?'

'হরগিস না। তাছাড়া ট্রামে-বাসে কি আমার চড়বার উপায় আছে? গাড়ীসুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাকবে আর খিলখিল করে হাসবে। তোমারও ছবি বেরুক না, দেখবে তখন রাস্তায় বেরুনো প্রাণান্তকর হয়ে উঠবে।'

একটা ট্যাক্সি ধরিয়া দু'জনে আরোহণ করিল; পাণ্ডুরঙ্ একটি ষ্টুডিওর ঠিকানা দিল, ট্যাক্সি চলিতে লাগিল। সোমনাথ পাণ্ডুরঙ্‌কে সিগারেট দিয়া নিজে একটা ধরাইল, প্রশ্ন করিল—'ছবি কতদিনে বেরুবে কিছু জানো?'

'ফাউন্টেন পেন বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেছে। তার মানে মাস খানেকের মধ্যেই বেরুবে।'

'বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে নাকি?'

'হাঁ, তবে এখন খুব বেশী নয়। ছবি বেরুবার হপ্তাখানেক আগে থেকে চেপে পাব্‌লিসিটি করবে। ফাউন্টেন পেন হুঁসিয়ার লোক, বাজে খরচ করে না।'

সোমনাথ একটু বিমনা হইল। বিজ্ঞাপনই চিত্রশিল্পের জীবন। ছবির বিজ্ঞাপনে তাহার নাম কি ভাবে থাকিবে কে জানে?

ক্রমে ট্যাক্সি নির্দিষ্ট ষ্টুডিওতে পৌছিল। ভাগ্যক্রমেই হোক, বা ট্যাক্সির মাহাত্মেই হোক, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, ষ্টুডিওর কর্তা রুস্তমজি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রুস্তমজি প্রবীণ বয়স্ক পার্সী, মাথায় ডাক-বাক্স টুপী, অনশনক্লিষ্ট

গৃধ্রের মত মুখের ভাব, চোখ ছুটি অতিশয় ধূর্ত। ইনি চিত্রশিল্পের নির্বাক যুগ হইতে এই কর্ম করিতেছেন, প্রায় পঞ্চাশটি ছবির জন্মদান করিয়াছেন। যদিও তন্মধ্যে মাত্র গুটি পাঁচেক ছবি ভাল হইয়াছে; তবু বাজারে তাঁহার বেশ নাম-ডাক আছে।

রুস্তমজি প্রথম কিছুক্ষণ পাণ্ডুরঙের সহিত আদিরসাশ্রিত রসিকতা করিলেন, তারপর কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ইনি আমার বন্ধু সোমনাথ, আমরা ছ'জনে পিলের ছবিতে কাজ করেছি। ইনি হিরো ছিলেন। আপনার যদি হিরোর দরকার থাকে—'

ইতিমধ্যে রুস্তমজি তাঁহার ধূর্ত চোখ দিয়া সোমনাথকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন; বলিলেন—'চেহারা তো লা জবাব! কাজও নিশ্চয় ভাল করেছেন?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—খুব ভাল কাজ করেছেন। যেমন চেহারা তেমনি কাজ—তুই পাল্লা সমান ভারি।'

রুস্তমজি বলিলেন—'বটে? তুমি জামিন হচ্চ?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আলবৎ—জামিন ইমান জামিন। আমার সুপারিশ যদি মিথ্যে হয় ডালকুর্তা দিয়ে আমাকে খাওয়াবেন।'

রুস্তমজি হাসিলেন—'পাণ্ডুরঙ্ তুমি মারাঠী তো?'

'জি।'

'তবে এমন মোগলাই বচন-বিন্যাস শিখলে কোত্থেকে? মারাঠী ভাইরা তো এমন চোস্ত-জবান হয় না।

'হুজুর, তবে শুনুন, আমার খানদানি কেচ্ছা বলি। —পেশোয়াদের আমলে মারাঠারা একবার দিল্লী দখল করেছিল জানেন বোধ হয়?

'জানি না, তবে হ'তে পারে। মারাঠীদের অসাধ্য কাজ নেই।'

'আমার পূর্বপুরুষ সেই মারাঠা পল্‌টনে ছিলেন। তিনি আর ফিরে এলেন না, দিল্লীতেই বসে গেলেন। সেই থেকে আমরা দিল্লীর বাসিন্দা।'

'বুঝেছি। তোমার বন্ধুও কি দিল্লীর বাসিন্দা?'

'না, উনি বাঙালী।'

রুস্তমজি বলিলেন—'মন্দ নয়। তুমি মারাঠী হয়ে দিল্লীর বাসিন্দা, উনি বাঙালী হয়ে বম্বের বাসিন্দা, আর আমি পার্সী হয়ে হিন্দুস্থানের বাসিন্দা। ভাল ভাল; কিন্তু উনি পিলের কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

সোমনাথ বলিল—'মিঃ পিলের সঙ্গে আমার মাত্র তিন মাসের কনট্রাক্ট্‌ ছিল—'

রুস্তমজি প্রশ্ন করিলেন—'পিলের অপ্‌শান ছিল না?'

'ছিল।'

'তবে সে ছেড়ে দিলে যে বড়?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'তাঁর সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল; কিন্তু কাজের সম্পর্কে নয়।

রুস্তমজি কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'হুঁ। আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে যান, যদি আমার দরকার হয় আপনাকে খবর দেব।—পাণ্ডুরঙ্‌, তুমি এখনও চন্দনার দিকে নজর দিচ্ছ না যে বড়?'

পাণ্ডুরঙ্‌ বলিল—'চাকরী যাবে হুজুর।'

রুস্তম বলিলেন—'তা বেশ তো। ফাউণ্টেন পেন যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, সটান আমার কাছে চলে আসবে। আমি তোমাকে বেশী মাইনে দেব।'

পাণ্ডুরঙ্‌ হাত জোড় করিয়া বলিল—'হুজুর মেহেরবান।'

ষ্টুডিও হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'বুড়ো ভারি ধড়িবাজ, আন্দাজ করেছে চন্দনা ঘটিত মনোমালিন্য। পিলের কাছে তোমার সম্বন্ধে সুলুক সন্ধান নেবে।'

সোমনাথ বলিল—'হুঁ। পিলে সাহেব বিশেষ ভাল সার্টিফিকেট দেবেন বলে মনে হয় না। এখানে কোনও আশা নেই পাণ্ডুরঙ্।'

পাণ্ডুরঙ বলিল—'তা বলা যায় না। যাহোক, কাল পরশু আমি আবার তোমাকে নিয়ে বেরুব, আরও দু'একজনের কাছে নিয়ে যাব। একটা না একটা লেগে যাবেই।'

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া পাণ্ডুরঙ্ সোমনাথকে অনেকগুলি চিত্র-প্রণেতার কাছে লইয়া গেল; কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা। চেহারা তো বেশ ভালই, কিন্তু পিলের চাকরি ছাড়লেন কেন? নাম-ধাম রেখে যান, যদি দরকার হয় খবর দেব। সোমনাথের মনে হইল, কোনও অদৃশ্য শত্রু চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোনও দিক দিয়াই বাহির হইবার পথ নাই।

একদিন বাড়ি ফিরিবার পথে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা পাণ্ডুরঙ্, আমার নামে ওরা কি বলেছে, যাতে আমি একেবারে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি? তুমি কিছু শুনেছ?' পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'বড় সাংঘাতিক কথা বলেছে?'

'কি? চন্দনা সম্বন্ধে?'

'পাগল! ওরা জানে তাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না। সিনেমা রাজ্যে স্ত্রীলোক ঘটিত দুর্বলতা কেউ গ্রাহ্য করে না। ওরা রটিয়েছে যে তুমি মন দিয়ে কাজ কর না, আর অর্ধেক ছবি তৈরী হবার পর মোচড় দাও।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। এমন আর্টিষ্ট আছে যারা অর্ধেক ছবি তৈরি হবার পর বাড়ি গিয়ে বসে থাকে, বলে বেশী টাকা দাও তো কাজ করব—নৈলে করব না। এই ব'লে মোচড় দিয়ে বেশী টাকা আদায় করে। তারা জানে অর্ধেক ছবি তৈরি হয়ে গেছে, এখন তাকে বাদ দিয়ে নতুন ক'রে ছবি তৈরি করতে গেলে অনেক খরচ। তাই এ রকম আর্টিষ্টকে প্রডিউসারদের ভারি ভয়।'

'কিন্তু কনট্রাক্ট আছে যে!'

'থাকলই বা কনট্রাক্ট্। আর্টিষ্ট বলে, আদালতে যাও। আদালতে গেলে দু'বছরের ধাক্কা। ততদিন ছবি বন্ধ রাখলে প্রডিউসারের সর্বনাশ হয়ে যাবে; তার চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া ভাল। তোমার নামে সেই অপবাদ দিয়েছে। ও অপবাদ যে আর্টিষ্টের হয়, তাকে কেউ কাঠি ক'রে ছোঁয় না।'

সোমনাথ হতাশ স্বরে বলিল—'তবে আর চেষ্টা করে লাভ কি পাণ্ডুরঙ্? তার চেয়ে দেশে ফিরে যাই।'

পাণ্ডুরঙ্ সহজে হার মানে না, বলিল—আর কিছুদিন দেখা যাক্। বদনাম দিলেই সকলে বিশ্বাস করে না। ছবিটা বেরুলে সুরাহা হ'তে পারে।'

পরদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। ছোট বিজ্ঞাপন, তাহাতে কেবল ছবির নাম ও চন্দনার হাসিমুখ আছে। অন্য কাহারও উল্লেখ নাই। চন্দনা দেবী যে শীঘ্রই আসিতেছেন এই খবরটি কেবল সাধারণকে জানানো হইয়াছে।

দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন আকারে বাড়িতে লাগিল। চন্দনার নাম ছাড়াও ক্রমে প্রযোজকের নাম, পরিচালকের নাম, সঙ্গীত পরিচালকের নাম, অন্যান্য আর্টিষ্টদের নাম, এমন কি ষ্টুডিওর দারোয়ানটার পর্যন্ত নাম ছাপা হইল কিন্তু সোমনাথের নাম

কুত্রাপি দেখা গেল না। একদিন মহাসমারোহ করিয়া খবরের কাগজের অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়িয়া চিত্রের মুক্তির দিন বিঘোষিত হইল— আগামী শনিবার বম্বের বিখ্যাত 'রসিক' সিনেমায় ছবি মুক্তিলাভ করিবে।

সোমনাথের মনের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অকস্মাৎ কোন্ অশুভ মুহূর্তে তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া বিপরীত মুখে যাত্রা সুরু করিলেন, কোনও কারণ দেখাইলেন না, ক্রটির ছিদ্র অন্বেষণ করিলেন না, কিন্তু সোমনাথের জীবনে সকলি গরল হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রত্নার চিঠি আসিল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যখন বর্ষণ হয় তখন আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। চিঠিখানা হাতে পাইয়া সোমনাথের মনে হইল, দুঃখের বরষায় সত্যই তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া জল ঝরিতেছে। রত্নার চিঠি দিদিকে লেখা। দিদি বোধ হয় চিঠির বক্তব্য সোমনাথকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না বলিয়া চিঠিখানি তাহার ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন।

সোমনাথ চিঠি খুলিয়া পড়িল।

শ্রীচরণেষু, ভাই বৌদি, শুনে সুখী হবে আমি পাশ করেছি। ফল খুব ভাল হয় নি, টায় টায় পাস। ভাবছি থার্ড ইয়ারে ভর্তি হব।

বম্বেতে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, তার উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিলাম। এখন দিচ্ছি। আমার মত নেই।

সোমনাথবাবু যে পথে নেমেছেন সে পথে পতন অনিবার্য। তাছাড়া, যিনি বিয়ে করে বাইরের আক্রমণ থেকে চরিত্র রক্ষা করতে চান তাঁর চরিত্রকেও আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না।

ভালবাসা নিও।

ইতি—

তোমার রত্না

রত্নার হাতের লেখা খুব সুন্দর, ছোট ছোট সুগঠিত অক্ষরগুলি মুক্তাশ্রেণীর মত পাশাপাশি সাজানো; কোথাও অপরিষ্কা নাই, কাটাকুটি নাই, দ্বিধা সংশয় নাই। রত্নার হস্তাক্ষর যেন তাহার চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

তিক্ত অন্তরে সোমনাথ চিঠিখানি সরাইয়া রাখিয়া দিল। আর কতদিন এভাবে চলিবে? সংসারের অবহেলাও অপমানের কি শেষ নেই?

দুই

শনিবার সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ চোরের মত চুপি চুপি ছবি দেখিতে গেল। ষ্টুডিওর চেনা লোক পাছে তাহাকে দেখিয়া ফেলে এ সঙ্কোচও তাহার মনে ছিল, কিন্তু 'সিক' সিনেমা আজ লোকে লোকারণ্য, চন্দনার নূতন ছবি দেখিবার জন্য সহরসুদ্ধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে; সোমনাথের সহিত চেনা কাহারও দেখা হইল না। টিকিট বিক্রয় অবশ্য বহু পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফুটপাতে কালাবাজারের কারবার চলিতেছিল। সোমনাথ দ্বিগুণ মূল্যে টিকিট কিনিয়া প্রেক্ষাগৃহে গিয়া বসিল।

ছবি আরম্ভ হইল। পরিচয় পত্রে মধুর বাদ্য-নিক্কণ সহযোগে

প্রথমেই চন্দনা দেবীর নাম, তারপর আর সকলে। অন্যান্য নটনটীর সহিত সোমনাথের নামটাও আছে বটে, কিন্তু সে-ই যে এই চিত্রের নায়ক তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু ছবি দেখিতে দেখিতে সোমনাথ তন্ময় হইয়া গেল। গল্পের বিষয়-বস্তুতে যত না হোক, তাহার প্রকাশভঙ্গীতে এমন একটি সরস মসৃণ নৈপুণ্য আছে যে দর্শকের মনকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং শেষ পর্যন্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখে। চন্দনার অভিনয় অতুলনীয় বলিলেও চলে; সোমনাথের ভূমিকা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রিয়দর্শন আকৃতি ও সহজ অনাড়ম্বর অভিনয় মনের উপর দাগ কাটিয়া দেয়। দর্শকমণ্ডলী যে তাহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহাও তাদের আচরণ হইতে বারবার প্রকাশ পাইল। চিত্রদর্শী জনতার অনুরাগ বিরাগ প্রকাশ করিবার এমন নিঃসংশয় ভঙ্গী আছে যাহা বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না।

ছবি শেষ হইলে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সোমনাথ অশান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরিল। জামাইবাবু অফিসের কাজে দু'দিনের জন্য পুনা গিয়াছিলেন, দিদিও পুনা বেড়াইবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে গিয়াছিলেন। সোমনাথ বাড়িতে একা। শূন্য বাড়ির ড্রইংরুমে সে একা বসিয়া রহিল। ভৃত্য আসিয়া আহারের তাগাদা দিল; সোমনাথের ক্ষুধা ছিল না, খাবার ঢাকা দিয়া রাখিতে বলিয়া সে আবার বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিল।

এখন সে কী করিবে? ছবি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সম্ভবত এই একই চিত্রগৃহে বৎসরাধিক কাল চলিবে। সোমনাথের অভিনয় ভাল হইয়াছে, এমন কি তাহার অভিনয় চিত্রটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে একথাও বলা চলে। অথচ তাহার কৃতিত্বের প্রাপ্য পুরস্কার সে কিছুই পাইল না, অজ্ঞাতনামা হইয়া রহিল। যে খ্যাতি ও

স্বীকৃতির উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্ভর করিতেছে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইল। এখন সে কী করিবে?

একটা প্রবল অসহিষ্ণুতায় তাহার অন্তর ছটফট করিয়া উঠিল। না, আর এখানে নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। কালই সে দেশে ফিরিয়া যাইবে। সেখানে যা হইবার হইবে। বোম্বাই আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে।

এই সময় টিং টিং করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। এত রাত্রে কে টেলিফোন করে? সোমনাথ উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

'হ্যালো?'

একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর হিন্দীতে প্রশ্ন করিল—'সোমনাথবাবু বাড়িতে আছেন কি?'

'আমিই সোমনাথ। আপনি কে?'

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর দিল না, টেলিফোন রাখিয়া দিল। কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোমনাথ ক্লান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ইহা বোধ হয় বোম্বাই রসিকতা; কিন্তু রসিক ব্যক্তিটি কে? কণ্ঠস্বর পুরুষের, সুতরাং চন্দনা নয়। তবে কি পিলে সাহেব? কিন্তু তিনি এমন অর্থহীন রসিকতা করিবেন কেন? দশ মিনিট এইরূপ চিন্তায় কাণামাছির মতো পাক খাইবার পর সোমনাথ শুনিতে পাইল, বাড়ির সম্মুখে একটি মোটর আসিয়া থামিয়াছে। পরক্ষণেই সদর দরজার ঘন্টি বাজিয়া উঠিল। সোমনাথ গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, ডাকবাক্স টুপীপরা ধূর্ত চক্ষু বৃদ্ধ রুস্তমজী দাঁড়াইয়া আছেন।

রুস্তমজী বলিলেন—'আমিই ফোন করেছিলাম!'

সোমনাথ সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল। রুস্তমজী বাজে কথায় সময় নষ্ট করিলেন না, বলিলেন—'আপনার ছবি এইমাত্র দেখে

এলাম। আমার ছবিতে আপনাকে হিরো সাজতে হবে। আমি হাজার টাকা মাইনে দেব।'

সোমনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে উত্তর দিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রুস্তমজী পকেট হইতে দশকেতা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া সোমনাথের সম্মুখে রাখিলেন—'এই নিন আপনার এক-মাসের মাইনে। আজ থেকে আপনি আমার কাজে বাহাল হলেন। আসুন, এই রসিদ দস্তখৎ করুন। পাকা কণ্ট্রাক্ট পরে হবে।'

রুস্তমজী একটি ছাপা রসিদ ও ফাউণ্টেন পেন সোমনাথের সম্মুখে ধরিলেন, সোমনাথ প্রায় অবশভাবে দস্তখৎ করিয়া দিল।

রুস্তমজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—'আজ আমি চললাম, রাত হয়েছে। কাল আপনি ষ্টুডিওতে যাবেন, তখন কথা হবে।'

দৃঢ়ভাবে সোমনাথের করমর্দন করিয়া রুস্তমজী বিদায় লইলেন।

সারা রাত্রি আনন্দে উত্তেজনায় সোমনাথের ঘুম হইল না। এ কী অভাবনীয় ব্যাপার! তাহার ভাগ্য-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল, এখন সেই প্রদীপ আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইহাকেই বলে পুরুষের ভাগ্য। রুস্তমজীর আশা তো সে ছাড়িয়াই দিয়াছিল—কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে ভোলেন নাই। কি অদ্ভুত মানুষ! রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নিজে আসিয়া টাকা দিয়া গেলেন; কিন্তু এত রাত্রে নিজে আসিলেন কেন? কাল সকালে একবার খবর পাঠাইলেই তো সোমনাথ কৃতার্থ হইয়া যাইত। মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই রুস্তমজী।

শুধু মহাপ্রাণ নয়, রুস্তমজী যে অতি দূরদর্শী ব্যক্তি তাহা জানিতে

সোমনাথের এখনও বাকি ছিল।

রাত্রি তিনটার সময় সে অনুভব করিল ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। মনে পড়িল রাত্রে আহার করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষে গিয়া দেখিল তাহার খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তখন পেট ভরিয়া আহার করিয়া সে তৃপ্তমনে শুইতে গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে পাণ্ডুরঙ্ আসিল, বলিল—'কাল আসতে পারি নি। ছবি ভাল হয়েছে। তোমার কাজ দেখে সবাই মুগ্ধ। চল, আজ তোমার ছবি দেখিয়ে আনি।'

সোমনাথ হাসিয়া বলিল—'ছবি আমি দেখেছি।' বলিয়া গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ বলিল।

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আরে, ভারি ঘাগী বুড়ো তো! পাছে আর কেউ কন্ট্রাক্ট করিয়ে নেয়, তাই রাত্তিরেই এসেছে। তুমি এক হাজারে রাজি হয়ে গেলে? দম দিলে বুড়ো দু' হাজারে উঠ্‌তো।'

সোমনাথ বলিল—'না না, এক হাজারই যথেষ্ট' তার বেশী কে দেবে পাণ্ডুরঙ্?'

'এখন অনেকেই দেবে। সব ব্যাটা ছবি দেখবার জন্যে ওৎ পেতে ছিল। আমরা যখন দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন কেউ গ্রাহ্যই করে নি। এইবার দেখো না—সবাই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবো।

'আরে নাকে দড়ি দেবে কি ক'রে—টাকা যে নিয়ে ফেলেছি।'

'হুঁ—কাজটা ভাল কর নি। যাহোক একটা কথা বলে রাখি, লম্বা কন্ট্রাক্ট কোরো না, একটা ছবির কন্ট্রাক্ট কোরো, বড় জোর দুটো। তোমার এখন সিতারা বুলন্দ্, টাকা রোজগারের মরসুম—এখন যদি বুড়ো রুসি-বাবার ফাঁদে পড়ে যাও, তাহলে ঐ এক

হাজার টাকাতেই জীবন কাটাতে হবে।'

পাণ্ডুরঙ্‌ নিঃস্বার্থ বন্ধু, তাহার কথা সোমনাথের মনে ধরিল; কিন্তু তবু, তাহার ঘোরতর দুঃসময়ে রুস্তমজীই আসিয়া প্রথম আশার আলো জ্বালিয়াছিলেন তাহাও সে ভুলিতে পারিল না।

পাণ্ডুরঙ্‌ চলিয়া গেলে সোমনাথ পর পর গোটা তিনেক টেলিফোন কল্‌ পাইল। সকলেই চিত্র-প্রণেতা, সকলেই মধুক্ষরিত কণ্ঠে তাহাকে ষ্টুডিওতে গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন; একজন এমন আভাসও দিলেন যে তিনি চুক্তিপত্র হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, সোমনাথ গিয়া তাহাতে বেতনের অঙ্কটি বসাইয়া দিবে; কিন্তু সোমনাথ সকলকে সবিনয়ে জানাইল যে সে পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং বারম্বার অনুরোধ জানাইলেন সোমনাথ যেন মুক্তি পাইলেই তাঁহাদের স্মরণ করে।

সোমনাথ বুঝিল তাহার কপাল খুলিয়াছে। এমন রাতারাতি কপাল খোলা সিনেমা ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রে হয় না।

স্নানাহার সারিয়া সোমনাথ বাহির হইল। প্রথমেই ব্যাঙ্কে গিয়া টাকাগুলি জমা দিতে হইবে। সোমনাথ কলিকাতায় যে ব্যাঙ্কে কাজ করিত সেই ব্যাঙ্কের একটি শাখা বম্বেতে ছিল, সোমনাথ পূর্ব-সম্পর্কের মমতায় সেই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখিয়াছিল।

টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া সোমনাথ রুস্তমজীর ষ্টুডিওতে গেল। পাণ্ডুরঙের উপদেশ তাহার মনে ছিল, সে ট্যাক্সি চড়িয়া গেল।

রুস্তমজী আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন, বলিলেন,—'আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তুমি আমাকে রুসি-বাবা বলে ডেকো। এখানে সবাই তাই বলে। আমার স্ত্রী পুত্র কেউ নেই, সব মরে গেছে, ষ্টুডিওর ছেলেরাই আমার ছেলে।'

সোমনাথ বলিল—'যে আজ্ঞে।'

রুস্তমজী তখন বলিলেন—'হ্যাখো সোমনাথ, আমি ত্রিশ বছর সিনেমা করছি, ভুরু দেখে মানুষ চিনতে পারি। তোমাকে দেখে আমি বুঝেছি তুমি বড় ভাল ছেলে; কিন্তু শুধু ভালমানুষ হলেই চলে না; সিনেমায় হিরো হতে গেলে ঠাট্ চাই। তুমি একটা মোটর কিনে ফ্যালো।

সোমনাথ অবাক হইয়া বলিল,—'মোটর? কিন্তু আমার তো মোটর কেনার টাকা নেই। আজকাল নতুন মোটর কিনতে গেলে—'

রুসিবাবা বলিলেন—'নতুন মোটর কেনবার দরকার নেই, পুরোনো হলেও চলবে।'

সোমনাথ বলিল—'কিন্তু পুরোনো মোটরই বা কোথায় পাব?'

'সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি যোগাড় করে দেব। আমার জানা একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটর আছে, ভাল অবস্থায় আছে, অষ্টিন টেন। আমি সস্তায় তোমায় কিনিয়ে দেব।'

সোমনাথ বিব্রত হইয়া বলিল—'কিন্তু মোটর কেনা কি নিতান্তই দরকার?'

রুস্তমজী বলিলেন—'দরকার। আমার ষ্টুডিওতে যে কেউ সাতশো টাকার বেশী মাইনে পায় তাকেই আমি মোটর কিনিয়ে দিয়েছি। ওতে ষ্টুডিওর ইজ্জত বাড়ে; তা ছাড়া, যার গাড়ী আছে তাকে পুলিসেও খাতির করে। তুমি ভেবো না। খুব সস্তায় গাড়ী পাবে; হাজার খানেকের মধ্যে। তাও নগদ টাকা দিতে হবে না, আমি মাসে মাসে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব। তুমি জানতেও পারবে না।'

সোমনাথ আর না বলিতে পারিল না, রাজি হইল। রুস্তমজী

তখন চুক্তিপত্রের খসড়া বাহির করিয়া সোমনাথকে দিলেন, বলিলেন—'একবার চোখ বুলিয়ে নাও, যদিও আপত্তি করার কিছু নেই।'

সোমনাথ পড়িয়া দেখিল, হাজার টাকা মাহিনায় পাঁচ বছরের চুক্তি, মাহিনা বাড়ার কোনও সর্ত নাই। পাণ্ডুরঙ তাহাকে পূর্বেই মন্তর দিয়াছিল, সে বাঁকিয়া বসিল—'আমি একটা ছবির জন্য কন্‌ট্রাক্ট করতে পারি, তার বেশী নয়।'

রুস্তমজী বোধ হয় মনে মনে আপত্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সোমনাথকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। নূতন অভিনেতার পক্ষে পাঁচ বছরের চুক্তি যে কতদূর ভাগ্যের কথা, যে শিল্পী দীর্ঘ চুক্তি করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ পাকা এবং নিরুদ্বেগ করিয়া লইতে চায় না তাহার ভাগ্য বিপর্যয় যে কিরূপ অবশ্যম্ভাবী, রুস্তমজী তাহা মসৃণ বাক্‌পটুতার সহিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সোমনাথ কিন্তু ভিজিল না। তাহার এখন সিতারা বুলন্দ, সে পাঁচ বছরের জন্য জীবন বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত নয়। শিল্পীর জীবনে পাঁচ বৎসর যে অতি দীর্ঘ সময়, অনেক অভিনেতার শিল্প-জীবন পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় তাহা তাহার অজানা ছিল না। ত্রিশ বছর বয়সের পর যাহারা নবীন হিরো সাজে তাহারা শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিবার চেষ্টা করে এবং হাস্যাস্পদ হয়; সুতরাং বেলা থাকিতে থাকিতে ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া লইয়া আলোয় আলোয় বিদায় লওয়া ভাল।

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর স্থির হইল, সোমনাথ এক হাজার টাকা মাহিনায় রুস্তমজীর দুইটি ছবিতে হিরোর কাজ করিবে; তবে এই দুইটি ছবির কাজ যতদিন শেষ না হয় ততদিন সে অন্য কাজ করিতে পারিবে না।

নূতন চুক্তিপত্র তখনই ছাপা হইয়া আসিল। সোমনাথ তাহাতে সহি করিয়া দিল। রুস্তমজী তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—'সোমনাথ, তোমাকে যতটা গোবেচারি ভেবেছিলাম তুমি তা নও। যাহোক, এ ভালই হল, তুমিও খুশী হলে—আমিও খুশী হলাম। এবার মন দিয়ে কাজে লাগতে হবে।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'কাজ আরম্ভ হবে কবে?"

'মাস খানেকের মধ্যেই। আর সব ঠিক আছে, কেবল গল্পটা নিয়ে একটু গোলমাল চলছে!'

'গল্প লিখেছেন কে?'

'একজন বাঙালী। নাম জানো কি? ইন্দুরায়।'

সোমনাথ লাফাইয়া উঠিল। ইন্দু রায়! ইন্দু রায়ের নাম শিক্ষিত বাঙালী কে না জানে? সোমনাথ তাঁহার লেখার প্রগাঢ় ভক্ত। সে উল্লসিত হইয়া উঠিল।

'তিনি কি বোম্বাইয়ে থাকেন?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই ষ্টুডিওতে আসেন। লেখক তো ভালই, কিন্তু বড় একগুঁয়ে। ক্রমে সকলের সঙ্গেই তোমার পরিচয় হবে।'

তিন

কাজ আরম্ভ না হইলেও সোমনাথ প্রত্যহ ষ্টুডিওতে যাতায়াত করিতে লাগিল। রুস্তমজী প্রায়ই তাহাকে নিজের অফিস ঘরে ডাকিয়া গল্প-গুজব করেন; বৃদ্ধের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বেশ গাঢ় হইয়া উঠিল। ষ্টুডিওর কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীর সহিতও আলাপ হইল।

দিগম্বর শম্ভুলিঙ্গম ষ্টুডিওর খাজাঞ্চি ও হিসাবনবিশ। ইনি মদ্রদেশীয়, সুতরাং অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে অতিশয় পোক্ত; কিন্তু জন্মাবধি তেঁতুল গোলা রশম খাইয়াই বোধকরি শম্ভুলিঙ্গ মহাশয়ের অন্তর বাহির একেবারে টকিয়া গিয়াছিল। এমন কি তাঁহার চেহারাটাও তিন্তিড়ি ফলের ন্যায় বক্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। সোমনাথের সহিত প্রথম আলাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—'আপনি ভাগ্যবান লোক, এই বয়সেই হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গেলেন। আর আমি এগারো বছর কাজ করছি—আমার মাইনে দু'শো টাকা—যাক—সবই ভাগ্য। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

শম্ভুলিঙ্গ প্রসঙ্গে রুস্তমজী একদিন হাসিয়া বলিলেন,—'শম্ভুলিঙ্গ খাঁটি লোক, পরের পয়সা ওর কাছে হারাম; [illegible] লোকটা সুখী হবার ফন্দি জানে না। ওকে যদি গলা টিপে দু'পেগ মদ গিলিয়ে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো—'

কিন্তু মদও শম্ভুলিঙ্গের কাছে পরধনের মতই অমেধ্য, তাই তাঁহাকে সুখী করা মানুষের সাধ্য নয়।

ইহার ঠিক বিপরীত চরিত্র—চক্রধর রায়। লোকটি লাহোরের পাঞ্জাবী, চিত্র-পরিচালক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। রুস্তমজীর সাম্প্রতিক কয়েকটি চিত্র পরিচালনা করিয়াছে। এমন দাম্ভিক ও আত্মপ্রসন্ন ব্যক্তি কম দেখা যায়। লোকটির চেহারা যেমন বাদশাহী আমলের মিনার গম্বুজ দিয়া তৈয়ার মনে হয়, অন্তরও তেমনি দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার স্তম্ভের উপর উদ্ধতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। নিজের প্রশংসা ও পরের নিন্দা ছাড়া তাহার মুখের অন্য কথা নাই। শিষ্ট সমাজে এরূপ ব্যক্তি একদণ্ডের তরেও আমল পাইত না, কিন্তু সিনেমা রাজ্যে নিজের ঢাক যে যত জোরে পিটাইতে পারে তাহার কদর তত বেশী। তাই চক্রধর রায় এক

গুণী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিচয়েই সোমনাথ বুঝিয়াছিল চক্রধর রায়ের সহিত তাহার পোষাই হইবে না। চক্রধরই পরবর্তী ছবি পরিচালনা করিবে ভাবিয়া সে একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিতে গেলে ঠোকাঠুকি অবশ্যম্ভাবী। অথচ রুস্তমজী চক্রধর সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করেন বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় 'যা হইবার হইবে' ভাবিয়া সোমনাথ মনের অস্বাচ্ছন্দ্য দমন করিয়া রাখিয়াছিল।

তৃতীয় যে ব্যক্তির সহিত সোমনাথের পরিচয় হইল তিনি লেখক ইন্দু রায়। সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, একটি কোট-প্যান্ট-পরা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসিয়া ষ্টুডিওর ওয়েটিং রুমে বসিয়া থাকেন, তারপর রুস্তমজীর সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাকে একটু কড়া মেজাজের লোক বলিয়া মনে হয়, কাহারও সহিত যাচিয়া কথা বলেন না, বরং নিজের চারিপাশে স্বতন্ত্রতার এমন একটি দৃঢ় গণ্ডী কাটিয়া রাখেন যে সহজে কেহ তাঁহার দিকে ঘেঁষিতে পারে না।

ইনি যে বাঙালী তাহাই সোমনাথ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ইনিই ইন্দু রায়, তখন সাগ্রহে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিল। ইন্দুবাবু প্রথমে একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার ছিপি আঁটা মন উন্মোচিত হইতে লাগিল। সোমনাথ দেখিল, ইন্দুবাবু আসলে বেশ মিশুক ও রসিক লোক, কিন্তু কোনও কারণে নিজেকে তিনি সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। হয়তো মন খুলিয়া কথা বলিবার মতো লোক পান না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সোমনাথ উৎসাহভরে বলিল—'আপনার লেখা আমার বড় ভাল

লাগে। এমন সহজ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠতা আর কারুর লেখায় দেখতে পাই না।'

ইন্দুবাবু ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ সোমনাথকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ব্যঙ্গ-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন,—'আমি পাঁচ বছর বোম্বাইয়ে আছি, কিন্তু এ ধরণের কথা কারুর মুখে শুনি নি। আপনি তাহলে বাংলা বই পড়েন।'

সোমনাথ বলিল—'আপনার সব বই পড়েছি।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'ভাল করেন নি। বোম্বাইয়ের প্রডিউ-সারেরা যদি জানতে পারে আপনি বই পড়েন, তাহলে আপনার নামে ঢ্যারা পড়বে।'

এই বক্রোক্তিটুকুর ভিতর দিয়া সোমনাথ ইন্দুবাবুর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাইল। সেই যে কোন্ গুণী ওস্তাদ বড় মানুষের বাড়িতে গান গাহিতে গিয়া 'নাকেড়া' গাহিবার ফরমাস পাইয়াছিল, ইন্দুবাবুর অবস্থা অনেকটা তাহার মতো। ভেড়ার শিংয়ে পড়িলে হীরার ধার ভাঙিয়া যায়, একদল অশিক্ষিত হস্তিমূর্খের মাঝখানে পড়িয়া ইন্দুবাবুরও অশেষ দুর্গতি হইয়াছে।

তাঁহার অন্তরের তিক্ততা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য সোমনাথ বলিল—'সিনেমা-শিল্প এখনও সাহিত্যের কদর জানে না সত্যি। ক্রমে জানবে বোধ হয়; কিন্তু আমি আপনার গল্পে কাজ করতে পাব ভেবে ভারি আনন্দ হচ্চে।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'আনন্দটা বোধ হয় বাজে খরচ করলেন।'

সোমনাথ চকিত হইয়া বলিল—'কেন? আমি তো শুনেছি আপনার গল্পই এবার হবে!'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'আমার গল্প এরা কিনেছে বটে কিন্তু কিনেই তাকে মেরামৎ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। সুতরাং

আমার গল্প শেষ পর্যন্ত কতখানি থাকবে তা বলতে পারি না।'

এই সময় চাকর আসিয়া ইন্দুবাবুকে রুস্তমজীর ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। সোমনাথ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ইন্দুবাবুর লেখার উপর কলম চালাইতে পারে এমন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি এখানে কে আছে? রুস্তমজী? চক্রধর রায়? সোমনাথ মনে মনে স্থির করিল, সুবিধা পাইলে সে এইরূপ আত্মঘাতী ধৃষ্টতার প্রতিরোধ করিবে।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল; ছবি আরম্ভ করিবার দিন আগাইয়া আসিতেছে। সোমনাথ টের পাইল, গল্প লইয়া ভিতরে ভিতরে একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিতেছে। একদিন দুপুরবেলা সে রুস্তমজীর ঘরে অনাহূত প্রবেশ করিয়া দেখিল, রুস্তমজী, চক্রধর রায় ও ইন্দুবাবু বসিয়া আছেন। গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে; ঘরের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথ চলিয়া যাইতেছিল, রুস্তমজী তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—'এসো সোমনাথ, তুমিও শোন।'

সোমনাথ একটু দূরে বসিল। ইন্দুবাবু যে বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যায়, তবু তিনি সংযত ভাবেই কথা বলিতেছেন—'নায়ক-নায়িকার ডুয়েট্ গান বাস্তব জগতে অসম্ভব হলেও নাটকে যে তা মানানসই করে দেখানো যায় একথা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু আমার এ গল্প সে-ধরণের নয়। আমার নায়ক-নায়িকা দুজনেই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাদের দিয়ে ডুয়েট গাওয়ানো অসম্ভব। মাফ করবেন, সে আমি পারবো না।'

চক্রধর রায় মাতব্বরি ভাবে বলিল—'ঐ তো আপনাদের দোষ, সিনেমার কিছুই বোঝেন না অথচ তর্ক করেন।'

ইন্দু রায় তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন—'আপনি আমার চেয়ে সিনেমা বেশী বোঝেন তার কোন প্রমাণ নেই।'

আলোচনা ক্রমশ ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল। সোমনাথ বড় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। শেষে রুস্তমজী তর্কে বাধা দিয়া বলিলেন—'দেখুন ইন্দুবাবু, আপনি যা আপনার দিক থেকে বলছেন তা সত্যি হতে পারে কিন্তু সিনেমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখছি ডুয়েট না থাকলে ছবি চলে না।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'ডুয়েট থাকলেও অনেক সময় ছবি চলে না দেখা গেছে।'

চক্রধর বলিল—'সে অন্য কারণে, ছবি তৈরী করবার সময় আমাদের দেখতে হয় পাব্‌লিক কি চায়। আমাদের দেশের পাব্‌লিকের বুদ্ধি দশ বছরের সমান। সেই হিসেব করে আমাদের ছবি তৈরি করতে হয়।'

ইন্দুবাবু বলিলেন,—'পাব্‌লিকের বুদ্ধি দশ বছরের ছেলের সমান এ বিশ্বাস যদি আমার থাকত, তাহলে আর কিছু না লিখে শিশু-সাহিত্য লিখ্‌তাম এবং আপনাদেরও উচিত ছেলে ভুলানো রূপকথা নিয়ে ছবি তৈরি করা।'

চক্রধর বলিল—'ওসব বাজে কথা। আপনি গল্পের মধ্যে ডুয়েট রাখবেন কিনা বলুন। অন্তত দুটো ডুয়েট আমার চাই-ই।'

ইন্দুবাবু রুস্তমজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'দেখুন, গল্প আপনি কিনেছেন, গল্পের চিত্রস্বত্ব এখন আপনার। আপনার পাঁঠা আপনি ইচ্ছে করলে ল্যাজের দিকে কাটতে পারেন, আমার কিছু বলবার নেই; কিন্তু ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।' বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

চক্রধর কিছুক্ষণ ধরিয়া গল্প-লেখক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিহীন একগুঁয়েমি

সম্বন্ধে গজ্ গজ্ করিয়া শেষে বলিল—'নতুন আইডিয়া গ্রহণ করবার ক্ষমতাই ওদের নেই। আমি মুন্সি বিস্‌মিল্লাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সে হুঁসিয়ার লোক, যা বলব তাই লিখে দেবে।'

রুস্তমজী বলিলেন—'তাই করতে হবে দেখছি। ইন্দুবাবু এমন অবুঝ লোক জানলে ওঁর গল্প আমি নিতাম না। যাহোক হুটোপাটি করলে চলবে না, একটু ভেবে দেখি।'

চক্রধর উঠিয়া গেলে রুস্তমজী সোমনাথকে বলিলেন—'তুমি তো সব শুনলে। কি মনে হ'ল?'

সোমনাথ বলিল—'গল্প না শুনে আমি কিছু বলতে পারি না।'

রুস্তমজী বলিলেন—'বেশ তো। গল্প এই রয়েছে, তুমি আজ বাড়ি নিয়ে যাও। ভাল করে পড়ে কাল এসে তোমার মতামত আমায় বলবে। তুমি যখন ছবির নায়ক, তখন তোমার মতটাও জানা ভাল।'

টাইপ-করা চিত্রনাট্যের ফাইল রুস্তমজী তাহাকে দিলেন। ফাইল লইয়া সোমনাথ বাড়ি গেল।

চিত্রনাট্যটি ইংরাজিতে লেখা, কারণ এখানে বাংলা কেহ বোঝে না। সংলাপগুলিও ইংরেজিতে, যথাসময় হিন্দীতে অনূদিত হইবে। তবু সোমনাথ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ইংরাজিতে লেখার জন্য ইন্দুবাবুর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আখ্যানবস্তু চমৎকার। একেবারে নূতন ধরণের গল্প। একটি বেকার যুবক কি করিয়া সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এই লইয়া কাহিনী। প্রেমের কথাও আছে বটে—কিন্তু তাহা অন্তঃসলিলা; কোথাও ছ্যাবলামি নাই, ডুয়েট গাহিয়া বা ভাঁড়ামি করিয়া নিম্নস্তরের রসসৃষ্টির চেষ্টা নাই; কিন্তু তবু পদে পদে ঘটনার সংঘাতে বহু বিচিত্র চরিত্রের সংঘর্ষে নাটকীয় রস জমাট

বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

পড়িয়া সোমনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই গল্প উহারা অদলবদল করিতে চায়? ডুয়েট গান* ঢুকাইয়া খেলো করিতে চায়? কখনই সে তাহা হইতে দিবে না। এজন্য রুস্তমজীর সহিত ঝগড়া হইয়া যায় সেও ভাল।

পরদিন একটু সকাল-সকাল সোমনাথ ষ্টুডিওতে গেল। দেখিল, রুস্তমজী তখনও আসেন নাই বটে, কিন্তু ইন্দুবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া ইন্দুবাবু বলিলেন—'এই যে কাল তো আপনি ছিলেন, সবই শুনেছেন। আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত করব বলে এসেছি।'

'কিসের হেস্ত-নেস্ত?'

'আমি ভেবে দেখলাম, ওরা যদি অদল-বদল করতে চায় আমি গল্প দেব না। টাকা এনেছি, গল্প ফেরত নেব।'

সোমনাথ বলিল,—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আগে আমি রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা করি, তারপর আপনি যা ইচ্ছে করবেন।'

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কেন—'কেন?'

সোমনাথ বলিল—'আমি আপনার গল্প পড়েছি, আমার খুব ভাল লেগেছে। রুস্তমজী আমার মতামত জানবার জন্যে [illegible] আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব যাতে গল্প অদল-বদল না হয়।'

ইন্দুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'আপনি চেষ্টা করতে চান করুন, কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা হবে। ঐ ব্যাটা চক্রধর রায় চক্কর ধ'রে বসে আছে, কাছে গেলেই ছোবল মারবে।'

'দেখা যাক।'

রুস্তমজীর আসিতে দেরী হইতেছে, তাই দুজনে বসিয়া একথা

সেকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ইন্দুবাবু নিজের সিনেমাক্ষেত্রে আগমনের কাহিনী বলিলেন—'কথায় বলে, থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল কর্‌লে এঁড়ে গরু কিনে। আমার হয়েছে তাই। বেশ ছিলাম সাহিত্য নিয়ে, হঠাৎ বোম্বাইয়ের এক নামজাদা ফিল্ম কোম্পানী ডেকে পাঠালো গল্প লেখার জন্যে। নাটকের দিকে আমার বরাবরই ঝোঁক—খুব মেতে উঠলাম। ভাবলাম এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ পেয়েছি; সিনেমা শিল্পকে উন্নত করে তুলব, ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য করে তুলব। সব ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই চলে এলাম। যে কোম্পানী আমাকে এনেছিল তাদের অবস্থা তখন টল্‌মল করছে; পর পর চারখানি ছবি মার খেয়েছে, এবার মার খেলেই কোম্পানী লাটে উঠবে। প্রযোজক মহাশয়ের অবস্থা অতি করুণ। যাহোক আমি তো গল্প লিখলাম। প্রযোজক মহাশয় অবশ্য গল্পটি সর্বাংশে পছন্দ করলেন না; কিন্তু বারবার ঘা খেয়ে তাঁর সারা গায়ে দরকচা, আমার গল্পে তিনি কলম চালাতে সাহস করলেন না। গল্প যেমন ছিল তেমনি ছবি হল।

'ছবিখানি উৎরে গেল—রৈ রৈ করে চলতে লাগল। কোম্পানীও দাঁড়িয়ে গেল। ব্যস্ আর যায় কোথায়! প্রযোজক মহাশয় মনে করলেন সব কৃতিত্ব তাঁরই। আশ্চর্য মানুষের আত্মপ্রতারণার ক্ষমতা। এতদিন যিনি কেঁচো হয়ে ছিলেন, তাঁর আর মাটিতে পা পড়ে না। আমার দ্বিতীয় গল্প তিনি কেটেকুটে একেবারে শতছিন্ন ক'রে দিলেন।...লোকটি নির্বোধ নয়, বিষয়বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ; কিন্তু বিষয়বুদ্ধি আর সৃষ্টিপ্রতিভা যদি এক বস্তু হ'ত তাহলে জগৎশেঠ জয়দেবের চেয়ে বড় কবি হ'তে পারত। ছবি যখন বেরুলো তখন লোকে আমাকেই গালাগালি দিতে লাগল। ছবি সাত

দিনও চলল না। আমি রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিলাম।

'তার পর থেকে ফ্রি লান্সিং করছি, ছবির বাজারে গল্প বিক্রি করি; কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। যিনিই গল্প কিনুন, তিনিই চান গল্পকে মেরামৎ করতে। যাঁর রসবোধ যত কম, মেরামৎ করবার বাতিক তাঁর তত বেশী। অথচ ছবি খারাপ হলে —বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর্, সব দোষ গল্প-লেখকের। গত পাঁচ বছরে আমার সাতখানা গল্প ছবি হয়েছে, কিন্তু তার একখানাও পাতে দেবার মতো হয় নি। মেরামৎ করে সবাই আমার গল্পের দফারফা করে দিয়েছে।

'একেই বলে চোরা গরুর দায়ে কপিলের বন্ধন; বাজারে বদনাম হয়ে যাচ্ছে—আমার গল্প চলে না। তাই ঠিক করেছি আর কাউকে গল্প বদলাতে দেব না। চুক্তিপত্রে সর্ত থাকবে—কেউ একটা কথা বদলাতে পারবে না। এতে আমার গল্প বিক্রি হয় ভাল, না হয় পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যাব।'

লাঞ্চের পর রুস্তমজি ষ্টুডিওতে আসিলেন। প্রবীণ ব্যবসায়ীদের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের মনের অবস্থা বড় একটা ধরা যায় না; রুস্তমজির মেজাজ যে বিশেষ কোনও কারণে ভিতরে ভিতরে অগ্নিবৎ হইয়া আছে তাহাও কেহ লক্ষ্য করিল না। বিশেষ কারণটি সাধারণের অজ্ঞাত হইলেও বড়ই গুরুতর।

রুস্তমজি নিজের অফিস ঘরে প্রবেশ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ গিয়া হাজির হইল, ফাইলটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—'গল্প পড়েছি।'

রুস্তমজির মন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল, তিনি মনকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—'হুঁ—কি মনে হ'ল?'

সোমনাথ দৃঢ়ভাবে বলিল—'চমৎকার গল্প। রুসিবাবা, এ গল্পের একটা কথা অদল-বদল করা চলবে না।'

এই সময় চক্রধর আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'আপনি তো বলবেনই; আপনিও বাঙালী কিনা।'

কথাটা এতই বর্বরোচিত যে সোমনাথ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আরক্ত মুখে চক্রধরের দিকে তাকাইয়া বলিল—'আপনাকে যখন প্রশ্ন করব তখন তার উত্তর দেবেন, Speak when you are spoken to—এখন আমি রুসিবাবার সঙ্গে কথা বলছি।'

চক্রধর এরূপ কড়া জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সে এমনই নিরেট অসভ্য যে আপত্তিকর কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই।

কিন্তু রাগ জিনিষটা ছোঁয়াচে। রুস্তমজির মনের নিগৃহীত উষ্মা এই সূত্রে বাহির হইয়া আসিল, তিনি তিরিক্ষি ভাবে বলিয়া উঠিলেন—'সোমনাথ, তুমি অবুঝের মতো কথা বলছ। লেখক যা লিখবে, তাই ছবি করতে হবে? তা হলে ছবি করবার কি দরকার—বই বাঁধা দপ্তরীর কাজ করলেই হয়।'

সোমনাথ মনের উত্তাপ দমন করিয়া বলিল—'উপমাটা ভাল দিয়েছেন। চিত্র-প্রণেতার কাজ দপ্তরীর কাজের মতোই, গল্পটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে দর্শকের সামনে হাজির করা—তার বেশী নয়।'

চক্রধর গাল ফুলাইয়া বলিল—'আমরা মাছি-মারা দপ্তরী নই। আমরা ছবি তৈরি করি, লেখক আমাদের মনের মতো গল্প লিখে দেয়; এই এখানকার রেওয়াজ। লেখকদের আমরা আস্কারা দিই না।'

সোমনাথ রুস্তমজিকে বলিল—'ইনি যাদের কথা বলছেন তারা

লেখক নয়—তারা মুহুরী। ইন্দুবাবু মুহুরী নন, তিনি প্রতিভাবান লেখক। তাঁর গল্প নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই।'

রুস্তমজি টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন—'আলবৎ আছে। আমি গল্প কিনেছি—আমার যেমন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে অদলবদল করব। কারুর কিছু বলবার নেই।'

সোমনাথ গোঁ-ভরে বলিল—'তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে—ছবি একদিনও চলবে না।'

রুস্তমজি আরক্ত-চোখে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—'আমি ত্রিশ বছর ছবি তৈরি করছি, পঞ্চাশটা ছবি করেছি। তুমি কালকের ছেলে আমাকে শেখাতে এসেছ—কি ক'রে ছবি তৈরি করতে হয়!'

সোমনাথ এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, এবার আর পারিল না; সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আপনি পঞ্চাশটা ছবি করেছেন বটে কিন্তু কটা ভাল ছবি করেছেন?'

রুস্তমজীও লাফাইয়া উঠিলেন—'ভাল ছবি! আমার পঞ্চাশটা ছবিই ভাল। তুমি তার ভাল মন্দ কী বুঝবে—সিনেমার কী জানো তুমি?'

'আমি অনেক কিছু জানি যা আপনারা জানেন না। আপনার পঞ্চাশটা ছবির মধ্যে পাঁচটিও ওৎরায় নি। তার কারণ কি জানেন না? আপনি লেখকের ওপর কলম চালান, খোদার ওপর খোদগারি করেন—' চক্রধরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—'এই সব অশিক্ষিত অপদার্থ লোকের পরামর্শে আপনি প্রতিভাবান লেখকের ওপর কলম চালাতে সাহস করেন।'

রুস্তমজি বলিলেন—'ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। আমার ছবিতে আমি যা-ইচ্ছে করব—যার পছন্দ হবে না সে কাজ করবে না।'

সোমনাথ বলিল—'সেই কথা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। আপনারা যদি গল্পে অদলবদল করেন আমি ছবিতে কাজ করব না।'

'কি—এত বড় কথা? যাও, আমার ছবিতে তোমাকে কাজ করতে দেব না। এখনি বিদেয় হও।'

চার

কোথাকার জল কোথায় গড়াইল।

মাথা ঠাণ্ডা হইলে সোমনাথ বিবেচনা করিয়া দেখিল, এতটা বাড়াবাড়ি না হইলেই ভাল হইত বটে, কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জা বা অনুতাপ অনুভব করিবার কোনও হেতু নাই। সত্যের জন্য, ন্যায়ের পক্ষে সে লড়িয়াছে। ইহাতে তাহার যদি ক্ষতি হয় তো হোক।

ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আর বিশেষ ছিল না। তাহার প্রথম ছবিতে সে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে; এখন যে-কোনও প্রযোজক তাহাকে লুফিয়া লইবে। সে রুস্তমজির কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে একবার খবর পাইলে হয়।

তবু তাহার মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ঝগড়াঝাটি সে ভালবাসে না, অথচ অতর্কিত ভাবে পরের ঝগড়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ইন্দুবাবুর সহিত পরে আর তাহার দেখা হয় নাই; তিনি হয়তো গল্প ফেরত লইয়াছেন।······রুস্তমজির সহিত এত শীঘ্র এমন ভাবে ছাড়াছাড়ি হইবে কে ভাবিয়াছিল; কিন্তু যেখানে চক্রধর আছে সেখানে ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব।···এই সময় পাণ্ডুরঙ্ থাকিলে শুধু সৎ পরামর্শই দিত না, তাহার সহিত কথা বলিয়া সোমনাথের

মন অনেকটা হাল্কা হইত ; কিন্তু পাণ্ডুরঙকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য কাজ। সে হয়তো আড্ডা দিতে বাহির হইয়াছে, কিম্বা কাজে গিয়াছে।

জামাইবাবু ও দিদি ইতিপূর্বে পুনা হইতে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু সোমনাথ তাঁহাদের কোনও কথা বলিল না। মিছামিছি তাহাদের উদ্বিগ্ন করিয়া লাভ নাই। একেবারে অন্য চাকরি যোগাড় করিয়া তাঁহাদের জানাইবে।

পরদিন সকালে সোমনাথ ব্যাঙ্কে গেল ; সেখান হইতে এক হাজার টাকা বাহির করিয়া ষ্টুডিওতে উপস্থিত হইল।

আজ রুস্তমজি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। এত্তালা দিয়া সোমনাথ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল।

একহাত কপালের উপর রাখিয়া রুস্তমজি নতমুখে টেবিলে বসিয়া আছেন ; সোমনাথের সাড়া পাইয়াও তিনি মুখ তুলিলেন না। সোমনাথ একটু অপেক্ষা করিয়া গলাঝাড়া দিয়া বলিল—'আপনার টাকা এনেছি।'

রুস্তমজি মুখ তুলিলেন। সোমনাথ চমকিয়া দেখিল, তাঁহার গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, মুখের ফরসা রঙ পাণ্ডাস বর্ণ ; ধূর্ত চক্ষুদুটির ধূর্ততা আর নাই, রাঙা টকটক্‌ করিতেছে। একদিনে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা সোমনাথ কখনও দেখে নাই। সে থতমত খাইয়া গেল।

'কিসের টাকা ?'

'আপনি যে টাকা আগাম দিয়েছিলেন।'

রুস্তমজি কিছুক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।—না, আগে দরজা বন্ধ করে দাও।'

দ্বার বন্ধ করিয়া সোমনাথ রুস্তমজির সম্মুখে বসিল।

রুস্তমজি আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'কাল সারা রাত্রি ঘুমোই নি, স্রেফ মদ টেনেছি।'

সোমনাথ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। একটা বিষম দুর্বিপাক ঘনাইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। সে নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

'—কাল তুমি রাগ করে চলে যাবার পর ইন্দুবাবু এলেন। তিনি তাঁর গল্প ফেরত চাইলেন। আমি বললাম—দেব না গল্প, আমি কিনেছি, গল্প আমার। তিনিও রাগারাগি করে চলে গেলেন।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—'কিন্তু—'

হঠাৎ রুস্তমজির স্বর ভাঙিয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—'আমি ডুবতে বসেছি, আমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, আর এই সময় তোমরা আমায় ফেলে পালাচ্ছ, কিন্তু তুমি সব কথা জানো না, তোমাকে দোষ দেওয়া অন্যায়। সোমনাথ, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তাই যে কথা কাউকে বলি নি তাই আজ তোমাকে বলছি—শোন।'

নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—'আমার স্ত্রী পুত্র নেই। স্ত্রী অনেক দিন গেছেন; ছেলেটা ছিল, সেও মদ খেয়ে আর বদ্ খেয়ালি করে মরেছে। তাদের জন্যে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু এই ষ্টুডিও আমার প্রাণ—আমার যক্ষের ধন। এ যদি যায়, আমি এক দিনও বাঁচব না।

'তুমি কাল বলেছিলে আমি অনেক ছবি করেছি বটে কিন্তু ভাল ছবি একটাও করি নি। তোমার কথা মিথ্যে নয়। ভাল ছবি করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। প্রথম প্রথম দু'একটা ছবি কিছু পয়সা দিয়েছিল সেই পয়সায় এই ষ্টুডিও কিনেছিলাম।

তারপর থেকে যত ছবি করেছি সব দু'কুড়ি সাত—কোনমতে খরচ উঠেছে, তার বেশী নয়।'

'এইভাবে চলছিল, কিন্তু গত তিনটে ছবিতে খরচ ওঠে নি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, নতুন ছবি করবার পয়সা নেই। বাইরে চাকচিক্য বজায় রেখেছি, কিন্তু ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় এসে ঠেকেছি যে ষ্টুডিও বাঁধা রেখে নতুন ছবি তৈরী করতে হবে। বুঝতে পারছ ব্যাপার? এবার যদি ছবি না ওৎরায় আমি ধনে-প্রাণে গেলাম।

'বাইরে বুঝতে দিই না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অবস্থা পাগলের মতো হয়েছে। কী করে ভাল ছবি তৈরী করব? কী করে মান-ইজ্জৎ বাঁচাব? আমি জানি—সত্যিকার ভাল ছবি তৈরি করবার ক্ষমতা আমার নেই, পঞ্চাশটা ছবি করে আমি তা বুঝতে পেরেছি। তবু ছবি তৈরি করতে আমি ভালবাসি, ওছাড়া অন্য কাজও কিছু জানি না—ছবি তৈরি করা আর বেঁচে থাকা আমার কাছে সমান। 'আমি মূর্খ, লেখাপড়া শিখি নি, সত্যিকার ভাল নাটক কাকে বলে তা আমি জানি না। ত্রিশ বছর আগে যখন একাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সকলেই আমার মতো ছিল, সবাই বেঁড়ে ওস্তাদ, না-পড়ে পণ্ডিত; কিন্তু আজকাল সিনেমায় ভাল লোক আসছে, ভাল ছবি দিচ্ছে, দর্শকদের রুচির উন্নতি হচ্ছে। এখন আমার ছবি কেউ চায় না।

'চক্রধরকে নিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম ও হয়তো ভাল ছবি দিতে পারবে, কিন্তু দু'টো ছবি যা তৈরি করেছে তাতেই বুঝতে পেরেছি, একটা windbag, একটা ধোঁয়ায়-ভরা ফানুস। ওর দ্বারা কোনও কালে ভাল ছবি হবে না।

'কাল আমি ষ্টুডিও বন্ধক রেখে আড়াই লাখ টাকা নিয়েছি, এই

আমার শেষ পুঁজি। এখন এ ছবি যদি ভাল না হয় তাহলে আমার ষ্টুডিও লাটে উঠবে। তোমরাই বলে দাও, আমি কী করে ভাল ছবি তৈরী করব। ইন্দুবাবু ভাল গল্প লেখেন, তাঁর গল্প নিয়েছি। তুমি ভাল আর্টিষ্ট, তোমাকে নিয়েছি। আর কি বল? টাকা খরচের ত্রুটি করব না, কিন্তু ছবি ভাল হবে কি?'

এই দীর্ঘ আত্মকথা শুনিয়া সোমনাথ বুঝিল—রুস্তমজির মানসিক অবস্থা এখন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যে কাল এত সহজে ধৈর্য হারাইয়াছিলেন তার কারণও সে বুঝিতে পারিল।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া সে বলিল—'রুসিবাবা, আমি একটা কথা বলব, আপনি শুনবেন?'

রুস্তমজি বলিলেন—'শুনব। তোমার কথা শুনব বলেই তো এত কথা তোমাকে বললাম।'

'আমার ওপর আপনি এ ছবি তৈরি করার ভার ছেড়ে দিন।'

'তোমার ওপর?'

'হ্যাঁ আমার ওপর। আমি টেক্‌নিক্ কিছুই জানি না, কিন্তু সেজন্যে আট্‌কাবে না। যে গল্প আমরা পেয়েছি, আমার বিশ্বাস আমরা ভাল ছবি তৈরি করতে পারব।'

রুস্তমজি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরক্ত চক্ষু সোমনাথের মুখের উপর স্থাপন করিলেন—'ছবি ওৎরাবে এ জামিন তুমি দিচ্ছ?'

মাথা নাড়িয়া সোমনাথ বলিল—'না। ছবি ওৎরাবে এ জামিন ভগবানও দিতে পারেন না। তবে ছবি ভাল হবে এ জামিন দিচ্ছি। রুসিবাবা, আমি নাটক লিখতে জানি না বটে, কিন্তু ভাল নাটক দেখলে চিনতে পারি। এ নাটক যত্ন ক'রে তৈরি করতে পারলে এমন জিনিষ হবে যা আজ পর্যন্ত ভাতবর্ষে হয় নি।'

রুস্তমজি দীর্ঘকাল দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া আসিয়া সোমনাথের কাঁধের উপর হাত রাখিলেন; বলিলেন—'সোমনাথ তুমিই ছবি কর।' তোমার সিতারা এখন বুলন্দ, হয়তো লেগে যেতে পারে। সিনেমা মানেই তো জুয়া খেলা—লাগে তাক্ না লাগে তুক্। যা হবার হবে, আর ভাবতে পারি না। আমার ভাবনার ভার তুমি নাও। সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল'—সব ভার আমি নেব।—কিন্তু চক্রধর?'

'ওটাকে আজই দূর করে দিচ্ছি। তোমার যাকে পছন্দ তুমি নাও, গল্প যেমন ইচ্ছে রেখো; কেউ তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আমার শুধু ভালো ছবি চাই।'

সোমনাথ আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে মনে বেশ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অনুভব করিতেছিল, এখন দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার পর সহসা তাহার মনে হইল সে একান্ত অসহায়। বিরাট পর্বত-প্রমাণ কাজের ভার সে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছে অথচ এ কাজের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা তাহার নাই, একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী পর্যন্ত নাই। সিনেমা জগতে কাজের লোক কাহাকেও সে চেনে না। এত বড় কাজ হাতে লইয়া শেষে কি ভরা-ডুবি করিবে! ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল!

রুস্তমজি বলিলেন—'কি ভাবছ? তোমার বর্তমান কনট্রাক্ট অবশ্য থাকবে না, নতুন কনট্রাক্ট হবে। তুমি যা চাও তাই দেব।'

সোমনাথ বলিল—'না, আমার আর কিছু চাই না, যা দিচ্ছেন তাই যথেষ্ট।'

রুস্তমজি বলিলেন—'তা হতে পারে না। নতুন কনট্রাক্টে তুমি এখন যা পাচ্ছ তাই পাবে, উপরন্তু ছবি থেকে যদি লাভ হয়, লাভের অর্ধেক তোমার। কেমন—রাজি?'

সোমনাথ বলিল—'রুসিবাবা, নিজের কথা আমি ভাবছি না। আপনার যা ইচ্ছে দেবেন, আমার কোনও দাবী নেই। আমি ভাবছি—'

এই সময় তার অনুক্ত ভাবনার উত্তর স্বরূপ দ্বারে টোকা পড়িল। রুস্তমজি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

পাণ্ডুরঙ্ ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাব।
—'হুজুর, গোস্তাকি মাফ করবেন। ফাউন্টেন পেনের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। চন্দনা দেবীর হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভেঙে দিয়ে এসেছি। এবার আমার একটা ব্যবস্থা করুন।'

রুস্তমজি হাসিয়া বলিলেন—'আমি কিছু পারব না। তোমাকে যে চাকরি দিতে পারে সে ঐ।' বলিয়া সোমনাথকে দেখাইলেন।

সোমনাথ ছুটিয়া আসিয়া পাণ্ডুরঙকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—'পাণ্ডু, তুমি এসেছ! বাঁচলাম।'

সেদিন অপরাহ্নে নূতন চুক্তি-পত্র সোমনাথের দ্বারা সহি করাইতে আসিয়া দিগম্বর শম্ভুলিঙ্গ বলিলেন—'আপনার কপাল বটে—এবেলা ওবেলা উন্নতি। আর আমি এগারো বছর ধ'রে—বলিয়া তিন্তিড়ীর ন্যায় অম্ল-করুণ হাসিলেন।